উসমানি সাম্রাজ্যের অজানা অধ্যায়

[উসমানি রাজবংশের অজানা দিক ও অন্তরালের ঘটনা]

বই	**উসমানি সাম্রাজ্যের অজানা অধ্যায়**
লেখক	মুস্তফা আরমাগান
আরবি ভাষান্তর	মুস্তফা হামজা
বাংলা রূপান্তর	সাঈদুল মোস্তফা
সম্পাদনা	মুফতী মহিউদ্দীন কাসেমী
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

উসমানি সাম্রাজ্যের

অজানা অধ্যায়

[উসমানি রাজবংশের অজানা দিক ও অন্তরালের ঘটনা]

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

অর্পণ

প্রাণপ্রিয় মা'য়ের
জান্নাতুল ফিরদাউস কামনায়....

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

- কোন সুলতানের পদচিহ্ন কখনও ইস্তাম্বুলে পড়েনি?
- তিনি কোন সুলতান যিনি নিজ হাতে আংটির কারুকাজ খোদাই করে বাজারে বিক্রি করতেন, সেই অর্থ গরিব-মিসকিনদের বিলিয়ে দিতেন?
- দ্বিতীয় আবদুল হামিদের প্রাণাধিক প্রিয় ঘোড়া বুলগেরিয়ান ডাকাতকে কে উপহার দিয়ে দিয়েছিল?
- ধুমপানের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখেছিলেন কোন সুলতান?
- কে সেই উসমানীয় সুলতান যার মায়ের পরিচয় জানা যায় না?
- সুলতানদের মধ্যে কারা কারা ক্রীড়া-সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?
- মাথায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদচিহ্ন নিয়ে ঘুরা সেই সুলতানকে চিনেন?
- কোন কোন সুলতান জহুরি, কাঠমিস্ত্রী ও দড়ির কারিগর ছিলেন?
- কাব্যমানের বিবেচনায় সামসময়িক কবিদেরকে পেছনে ফেলে দেওয়া সেই কবি-সুলতানকে চিনেন কি?
- নিজ মায়ের রুহানি ইসালে সওয়াবের জন্য কে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং নিজ হাতে খোদাই করেছিলেন মায়ের মর্যাদার হাদিস?

উসমানি সাম্রাজ্যের অজানা অধ্যায় আপনার সামনে দৃশ্যমান ইতিহাসের অদেখা গল্পগুলোর মুখোশ উন্মোচন করবে। শতসহস্র তথ্যসূত্র থেকে বেছে নেওয়া রোমাঞ্চকর ঘটনা ও তথ্য পরিবেশন করবে। শেষ পাতা পর্যন্ত এক নিশ্বাসে না পড়া অবধি আপনি ছটফট করতে থাকবেন।

এমন একটি অনন্য গ্রন্থ আমাদেরকে ভাষান্তর করে উপহার দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় সাইদুল মোস্তফা। মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে এটিই তাঁর প্রথম অনুবাদ। কিন্তু প্রথম অনুবাদ হিসেবে বইটি আমি যতবার পড়েছি, ততই মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছি। কী অসাধারণ অনুবাদ। আল্লাহ তাঁর হায়া আমাদের জন্য আর দীর্ঘ করুন।

সম্পাদনা ও বানান সমন্বয় করেছেন শ্রদ্ধেয় মুফতি মহিউদ্দীন কাসেমী। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

প্রিয় পাঠক, ইতিহাসের এমন সব গুরুত্বপূর্ণ বই যতটা গুরুত্বপূর্ণ তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এগুলো সুন্দর ও নির্ভুল প্রকাশ করা। আমরাও সেই চেষ্টায় কোনো ধরনের ত্রুটি করিনি। তারপরও কোনো অসংগতি বা কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সংশোধনের মনোভাব নিয়ে অবহিত করবেন বলে আশা রাখি। আমরা সংশোধন করে নেব—ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
১৪ নভেম্বর, ২০২০ খ্রি.

অনুবাদকের কথা

অনুবাদকর্ম অনেকটা রক্তদানের মতো। এক ভাষার দেহে সাহিত্য-গবেষণার যতটুকু শূন্যতা তৈরি হয় অন্য ভাষা থেকে ঠিক ততটুকুই এনে দেওয়ার আমানত অনুবাদকদের ঘাড়ে ন্যস্ত থাকে। এ যেন এক দেহের রক্ত অন্য দেহে প্রবেশ করানোর মতো। তাই অনুবাদের জগতে চিকিৎসকদেরকেও খুব সতর্কতা ও সংবেদনশীলতার সাথে অনুবাদকর্মের গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়।

আরবি থেকে অনুবাদের একটা ভালো দিক হলো, বিষয়বস্তু যতই দুনিয়াবি হোক সেখানে কিছু-না-কিছু দ্বীনি আমেজ থাকবেই, এটা আরবি ভাষার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি। অনুবাদের ফাঁকে ফাঁকে অনুভব করেছি এককালে উসমানীয় সালতানাতের সাংস্কৃতিক প্রভাব সুদূর বঙ্গদেশকেই কতটা ঘনিষ্ঠ করে নিয়েছিল। যেমন, মুরাদ ও বায়েজিদ নামগুলি আরবে প্রচলিত নেই, কিন্তু এই উপমহাদেশে নামগুলো এখনও তুমুল জনপ্রিয়।

আবহমান কাল থেকেই শাসকদের জীবনাচার নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে রহস্য, কৌতূহল ও জল্পনা-কল্পনার কমতি ছিল না। তারা কী করে? দেখতে কেমন ছিলেন তারা? কেমন তাঁদের মনোজগৎ? সাংসারিক ব্যস্ততা কিংবা জাগতিক কষ্ট, সুখ-দুঃখ তাদেরও কি ছুঁয়ে যায়? তাঁদের শখ কিংবা জনসম্পৃক্ততা কেমন ছিল? বিশেষত যখন উসমানি সালতানাতের ইতিহাস আমরা পাঠ করি তখন অবলীলায় আমাদের চোখে ভেসে উঠে রণক্ষেত্রের যুদ্ধংদেহি সুলতানদের চেহারা। বস্তুত ঐতিহাসিকরা আমাদেরকে এভাবেই ইতিহাস দেখান। কিন্তু এই রক্তক্ষয়ী চেহারার পেছনেও যে একটা একান্ত জীবন আছে, আছে তাঁদের ভেতরে বসবাস করা একেবারেই সাদামাটা কিছু মানুষ—সে ইতিহাসও জানার কৌতূহল পাঠকসমাজে কম না। বইটি পাঠককে সুলতানি প্রাসাদের ভেতর-বাহির ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবে।

শাসকদের অনেক বিষয় গোপন থাকে। তাঁদের জীবনাচার, হেরেম, অন্দরমহল, যুদ্ধবিগ্রহ, বিদ্রোহ ও হত্যাকাণ্ড—এসবের অনেককিছু সেই

সময় জনসাধারণের কাছে গোপন থাকলেও পরবর্তীতে ইতিহাস তা উন্মোচন করেছে। তাই আমরাও বসে থাকিনি, জানতে চেয়েছি এবং জানাতে চেয়েছি প্রাসাদের সর্বোচ্চ গোপন তথ্যগুলো। চিত্রসহ তাই আপনাদের সামনে বইটির অনুবাদ করার প্রয়াস পেয়েছি।

উল্লেখ্য, এটি অনুবাদ। আমার লিখিত কিছুই এখানে নেই। মূল লেখক ইতিহাস সেঁচে যা তুলে এনেছেন; আমি শুধু বাংলাভাষায় আপনাদের সামনে পরিবেশন করেছি। এখানে বিখ্যাত অনেক কবিতা আছে, হামদ আছে, নাতে রাসুল আছে; সেসবের বাংলা সংস্করণ করার চেষ্টা করেছি মূল ভাব ও ছন্দের মিল রেখে। বইটিতে চিত্রসহ তুলে ধরা হয়েছে উসমানি সুলতানদের জীবনঘনিষ্ঠ অজানা দিক।

একটি সাম্রাজ্য কিংবা সভ্যতা বিনির্মাণের পেছনে যাদের ভূমিকা থাকে সেই সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের সংস্কৃতিতে তাঁদের ব্যক্তিগত রুচি, মনন ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব থাকে, একইভাবে যেকোনো জাতি, রাষ্ট্র কিংবা সভ্যতা ধ্বংসের পেছনেও থাকে এর ধারক-বাহকদের চারিত্রিক ও মানসিক অধঃপতনের প্রভাব। উসমানীয় সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুলতানদের মধ্যে কী এমন গুণাগুণ ছিল যা একটি নতুন সাম্রাজ্যের উন্মেষ ঘটতে উদ্দীপকের কাজ করেছে?! সাম্রাজ্যের শেষদিকের সুলতানদের মধ্যেই বা কি এমন দুর্বলতা দেখা দেয় যা তিলে তিলে সালতানাতের মানচিত্রকে ক্রমেই ক্ষয়ে দিচ্ছিল?! শাসকের দুর্বলচিত্ত কিংবা আত্মবিশ্বাস সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের হিসেব গড়ে দেয়। কেন ও কীভাবে? বইটিতে পাঠক এসব খুঁজে পাবেন আশা করি।

সর্বোপরি, বইটি উচ্চশিক্ষা ও ইতিহাসগবেষকদের জন্য একটি অমূল্য রেফারেন্স হিসেবে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। বিশেষ করে যাদের আগ্রহের বিষয়বস্তু ইসলামের ইতিহাস তাঁদের কাছে গোটা উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রায় সাতশ বছরের সংক্ষিপ্ত তথ্যনির্ভর বই হিসেবে এর চেয়ে চমৎকার আর কিছুই হতে পারে না।

অনুবাদের কাজ যখন হাতে নিই তখন আমার মায়ের কাছে বলেছিলাম—মা একটা বইয়ের কাজ শুরু করেছি; মা অনেক খুশি হয়েছিলেন। অনুবাদ শেষ হলো, বইও ছেপে এলো; কিন্তু মা আর নেই। তিনি চলে গেছেন রবের ডাকে সাড়া দিয়ে। আল্লাহ তুমি আমাদের সকলের মা-বাবাকে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত করো। আমিন।

—সাঈদুল মোস্তফা
রিয়াদ, সৌদি আরব
১০ নভেম্বর ২০২০

ভূমিকা

‘উসমানিরা দিগ্বিজয়ী, সফলকাম। তাঁরা ফি সাবিলিল্লাহ’র পথিক। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তাঁরা বিলিয়ে দিয়েছে সত্য ও নুসরতের পথে। দ্বীনের অববাহিকায় ব্যয় করেছে অঢেল রত্ন ও অমূল্য রাজকোষ। দুনিয়ার কুহেলিকা তাদের ধোঁকায় ফেলতে পারেনি। শিরিকের ধ্বজাধারীদের ওপর তাঁরা চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে—উরক্কুশ বেগ।

উসমানি সুলতানদের নাম শুনলেই সাধারণত আমাদের সামনে উন্মুক্ত তরবারি হাতে রক্তক্ষয়ী রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়া একদল সেনাপতির অসম লড়াইয়ের দৃশ্য ভেসে উঠে। চোখে ভাসে রাজনীতির ময়দানে বিশ্বনেতাদের সামনে অগ্নিগর্ভ বক্তব্য দেওয়া দিকপাল উসমানি নেতৃবর্গ। কিন্তু আমরা মনে করি ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পাওয়ার মতো তাদের জীবনে মানবিক কোনো দিক নেই।

আমরা ধরেই নিয়েছি—তাদের যেন কোনো কান্নার গল্প ছিল না, ছিল না হাসির স্মৃতি, কিংবা ছিল না আনন্দ-বেদনার কোনো অনুভূতি। তাদের কোমল হৃদয়ের গল্পগুলো অপ্রকাশিত থেকে যাওয়ায়, আমরা নতুন করে ইতিহাসের পরতে দৃষ্টি মেলে ধরতে চাই, যে দৃষ্টিতে উঠে আসবে তাদের অজানা গল্পগুলো। যে গল্পরা বদলে দেবে আমাদের মগজে গেড়ে বসা তাদের সেই কঠিন চেহারাগুলো, তাদের কর্কশ ইতিহাসগুলো।

ইতিহাসের খটমটে বইগুলো উসমানি সুলতানদেরকে স্রেফ কিছু অস্ত্রধারী যোদ্ধা হিসেবে তুলে ধরেছে, রাজপ্রাসাদের বাহিরে যাদের হৃদয়ছোঁয়া কোনো উপাখ্যান নেই। এসব ইতিহাসপাঠ তাদের ভেতরে থাকা দয়া ও মনুষ্যত্বের দিগন্তকে মেলে ধরতে পারেনি; ফলে আমাদের অন্তরগুলো তাদের ভালোবাসায় আন্দোলিত হতে বাধা পায়। অথচ এমনটা হওয়ার তো কথা ছিল না!

সাম্রাজ্যের অধিকারী হলেও দিনশেষে তাঁরাও ছিলেন আপনার-আমার মতোই সাধারণ মানুষ। তাদেরও মাথাব্যথা হতো, নখ লম্বা হলে কাটতে হতো। তাঁরাও দাঁতের ব্যথায় কাতর হতেন, বিরক্তিবোধ করতেন, আবার ভালোবাসায় সিক্তও হতেন। সুলতান প্রথম আবদুল হামিদ তাঁর স্ত্রী রুহশাহকে নিয়ে যে প্রেমকাব্যটি রচনা করেছিলেন তা এখনও অমর হয়ে আছে। কাব্যের পঙক্তিতে পঙক্তিতে ফুটে উঠেছে তিনি নিজের সুপ্ত প্রণয় মেলে ধরতে কতটা দক্ষ ছিলেন।

যুদ্ধ ও বিজয়ের রোমাঞ্চ তাদের মন প্রশান্ত করতে যথেষ্ট ছিল না, সুলতানদের অনেকেই অবসাদ কাটাতে সুর-মূর্ছনা, কাব্য, পশু-শিকার, অশ্বারোহণ, মল্লযুদ্ধের মতো বিনোদনে অবগাহন করতেন। কখনো সময় কাটাতেন কাঠশিল্প কিংবা কারুশিল্প নিয়ে, এমনকি অনেক সময় দেখা যেত মেয়েলি কাজ সূচিকর্ম কিংবা হস্তশিল্প নিয়েও ব্যস্ত হতে। কিন্তু তাদের এই শৈল্পিক অবসরযাপন স্বেচ্ছায় হোক বা ভুলে ইতিহাসের পাতায় কেউ লিখে রাখেনি।

উসমানি সুলতানদের এই সাধাসিধে জীবনের অদেখা গল্পগুলোর আদ্যোপান্ত নিয়ে আলাদা গ্রন্থ রচনা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কিংবা সমরবিদ হিসেবে তাদের ঘটনায় ইতিহাস টইটম্বুর। কিন্তু বিশেষ করে সাধারণ মানুষ হিসেবে তাদের জীবনের অজ্ঞাত কাহিনি তুলে ধরার কাজটি হয়ে উঠেনি, ইতিহাসের গম্ভীর আলাপের ফাঁকে তাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে দু-চার লাইন হয়তো উল্লেখ হয়ে থাকে।

আপনাদের হাতে কদাচিৎ এমন কিছু আলোচনা এসে থাকবে যা সুলতানদের কাব্য রচনার দিকটা তুলে ধরে, কিংবা হস্তলিপি ও সুর যোজনার বিবরণ আছে, এগুলো তাদের বাড়তি সময়ের শখের বস্তু নিয়ে আলাপ। কিন্তু আলোচনাগুলো সব সময় নির্দিষ্ট গণ্ডির বাহিরে যায় না। যেমন ধরুন, “হস্তলিপিবিশারদ সুলতান” বা “সুরকার সুলতান” এরকম শিরোনামে বেশকিছু প্রবন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু এই বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধগুলো অগোছালো, দীর্ঘ আলোচনার ফাঁকে খণ্ড-খণ্ড ঘটনা তুলে ধরে মাত্র। কিন্তু যখনই আমরা তাদের শৈল্পিকতার নান্দনিক গল্পগুলোর আরও গভীরে প্রবেশ করতে যাই, তখনই উন্মেষ ঘটে আশ্চর্য সৌন্দর্যের। ঘটনার মোড়ে মোড়ে অপেক্ষা করে স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতো উপাখ্যান। সুলতানদের সৌখিন শিল্পকর্মের মধ্যে সব সময় সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের অলংকারিক কাঠশিল্পের কথা আলোচিত হয়, কিন্তু এই শিল্পগুণ যে তিনি

তাঁর পিতা আবদুল মাজিদ থেকে অর্জন করেছেন এই মূল্যবান তথ্যটা তুলে ধরার মতো লেখাজোখার দেখা পাওয়া দুষ্কর।

তাই এই গ্রন্থটি রচনার পেছনে আমার উদ্দেশ্য ছিল, শতসহস্র বইপুস্তকের ভীড় থেকে এবং ইতিহাসের বিশ্বকোষ থেকে দুর্লভ ও রত্নতুল্য ঘটনাগুলো ছেঁকে বের করে আনা। সময়ের প্রলেপে ঢেকে যাওয়া উসমানি ইতিহাসের মনোমুগ্ধকর গল্পগুলোর তালা খুলে দেওয়া। এই অন্তপুরবাসী লাজুক ইতিহাসের পরতে পরতে পাঠকের হৃদস্পন্দন বাড়তেই থাকবে।

প্রামাণ্য তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে লিখিত এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে আরও বিশদ ও বৃহৎ কলেবরে রচনা করা সম্ভব। মূল কাঠামোর ওপর উসমানি সুলতানদের নানান শিল্পকীর্তির নমুনা, কাব্য ও সুরের উপমা, তাদের আমোদ বিনোদন ও হাস্যরসের উদাহরণ দিয়ে গ্রন্থটিকে আরও চওড়া করার সুযোগ ছিল; কিন্তু এমনটা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার লক্ষ্য ছিল যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিশুদ্ধ তথ্যগুলো তুলে ধরা। আর সেই তথ্যভান্ডারের উৎস জানিয়ে দেওয়া—যেখান থেকে আমি রত্নগুলো তুলে এনেছি। যাতে করে আগামীর গবেষকদের কাছে এর ঠিকানাটা জানা হয়ে যায়। এর চেয়ে বড় কথা হলো, আমি চেয়েছি উসমানি সুলতানদের পারিবারিক সংস্কৃতির কেল্লায় আমিই প্রথম প্রবেশ করে উত্তরসূরিদের পথ দেখাব। অনাগত প্রজন্মের সামনে উসমানি সাম্রাজ্যের অজানা পাঠের ডালা মেলে ধরব, ফলে তারাও অন্যদের কাছে এই সুখপাঠ্য ইতিহাসের প্রেমে মজবে। আমার উদ্দেশ্য সব সময় একটাই—ইতিহাসকে সুখপাঠ্য করা এবং ইতিহাসকে ঘিরে পাঠকের মনে চিন্তার খোরাক তৈরি করা।

এই নতুন ইতিহাস আপনাদের কানে ফিসফিসিয়ে বলবে, এতদিনের জেনে আসা উসমানি সম্রাটদের মারকুটে চরিত্রের আড়ালে রয়েছে সুপ্ত কিছু আবেগি ইতিহাস—যা প্রচলিত গ্রন্থগুলোতে অনুপস্থিত। বইয়ের পাতায় পাতায় আপনার চোখে ভেসে উঠবে কখনো সুলতান আল-ফাতিহ বাগানে হেঁটে-হেঁটে গোলাপ তুলছেন আর গুনগুনিয়ে গান গাইছেন, কখনো দেখতে পাবেন প্রতাপশালী সুলতান সালিম স্বর্ণ গলিয়ে নান্দনিক অলংকার বানাচ্ছেন। মনে হবে আপনি সুলতান ২য় সালিমের পাশে বসে দেখছেন—নিজে হজে যেতে না পারার আক্ষেপ ঘুচাতে তিনি হাজিদের জন্য পাথেয় গুছিয়ে দিচ্ছেন।

তিন-তিনটি মহাদেশ দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন করা উসমানি সুলতানদের ব্যক্তিজীবনের অজানা ইতিহাসের পসরা মেলে ধরবে এই গ্রন্থ।

পরিশেষে, এ গ্রন্থের মৌলিক বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু আলোকপাত করা যাক।

উসমানি রাজপরিবারের প্রতিটি সদস্য উত্তরাধিকার সূত্রেই রকমারি হস্তশিল্প ও নানারকম কারিগরি শিল্পকর্ম চর্চায় অভ্যস্ত ছিল। শৈশব থেকেই উসমানি শাসকরা তাদের পরিবারের সন্তানদেরকে ঘরোয়া পরিবেশেই ভ্রাতৃত্ব রক্ষাকারী যোগ্যতা (যেমন, বিভিন্ন পেশায় সিদ্ধহস্তদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক) ও তারুণ্যের নানান দিক প্রশিক্ষণ দিতেন। রাজপরিবারের মননে ইসলামি ও তুর্কি সংস্কৃতি এমনভাবে যুগ-যুগ ধরে জিইয়ে ছিল যে, প্রত্যেক যুবককে জীবনঘনিষ্ঠ পেশা কিংবা শিল্প শিখে নিতে হতো যাতে করে কখনো ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হলেও তাদের জীবিকা উপার্জন করতে কোনো কষ্ট না হয়। ফলে এই সময়গুলো ছিল উসমানি খেলাফতকালের সোনালি যুগ-স্বরূপ। যার ফলাফল বাস্তব ও ব্যাবহারিক ময়দানে দেখা গিয়েছে। চমকপ্রদ তথ্য হলো, তাদের এই পারিবারিক ঐতিহ্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বহমান ছিল।

ইসমাইল দানিশমুন্দ যথার্থই বলেছেন, সুলতানরা বিভিন্ন শিল্পবিদ্যা চর্চার মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতেন। তিনি বলেন—সুলতানদের সেসব কারিগরি দক্ষতা তাদের জীবিকা নিশ্চিত করত; পণ্যগুলো কখনো চীনদেশে বিক্রি হতো, কখনো অন্য রাজত্বের রাজপ্রাসাদে যেত, আবার কখনো বাজারের ক্রেতারাই এর জন্য ভীড় জমাত।' এই গ্রন্থে আপনারা এমনই কিছু চমকপ্রদ অনুসন্ধানের সন্ধান পাবেন।

এটাই বাস্তবতা যে, ভবিষ্যতের সুলতানদের শিল্পদক্ষতা ও কারিগরি সক্ষমতা রাজপ্রাসাদেই গড়ে উঠেছিল, যে শিক্ষানিকেতনকে "আমিরদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান" বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।[১] আর এটাও সত্য যে, একটি শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজের একমাত্র অভিজাত রাজকীয় পরিবার শিল্প ও কারিগরি শিক্ষা প্রসারে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করবে। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আমি উসমানি সুলতানদের সৌখিন দক্ষতা তুলে এনেছি। শিল্পনৈপুণ্যের দিকে তাদের ঝোঁক, তাদের পেশা, শিল্পকর্ম, তাদের অনুরাগ, শিষ্টাচার, ব্যক্তিত্ব ও তাদের চর্চিত নীতি-নৈতিকতার নানান

---

[১] এই শিক্ষাকেন্দ্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন- হিয়া ইরফিল ম্যাগাজিনের ২৪ তম জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত "তোপকাপি রাজপ্রাসাদে আমিরদের শিক্ষাকেন্দ্র" ইতিহাস কথা বলে। পৃষ্ঠা : ২০৫৮-২০৫৯

প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে। খুবই পরিপাটি ও গোছানো কলেবরে ফুটে উঠেছে সেইসব গল্পগাথা।[২]

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের সামনে এক বর্ণিল প্রদর্শনীর পর্দা উন্মোচন হতে যাচ্ছে, পাঠক আপনি এমনসব ব্যক্তিত্বের পরিচয় লাভ করতে যাচ্ছেন—যাদেরকে মনে হবে খুব নিকট কোনো আপনজন, যাদেরকে গ্রহণ করে নিতে আপনি উন্মুখ হবেন। এক নীরব ইতিহাস ভ্রমণে নিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে—যার প্রতি মোড়ে মোড়ে অপেক্ষা করছে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের ব্যক্তিগত অনবদ্য গল্প। ইতিহাস তো লিখিতই হয় এমনসব ব্যক্তিদের পরিচয় তুলে ধরতে!

—মুস্তফা আরমাগান
উমরানিয়্যাহ, অক্টোবর, ২০০০

---

[২] প্রচলিত আছে, কিছু উসমানি সুলতানদের নাম অজানা রয়ে গেছে যারা চর্মশিল্প ও ছুরির খাঁজ শিল্পে পারদর্শী ছিল, সম্ভবত এর বিশেষ কোনো পদ্ধতি ছিল তাদের কাছে বা কোথাও লিপিবদ্ধ করা হয়নি, যা আমরা কখনোই জানতে পারব না।

সুচিপত্র

সুগুতে নবজাতকের কান্না : গাজি উসমান ১৯
সংশপ্তক : ওরহান গাজি ২৬
মাওলানা জালালুদ্দিন অনুরাগী
প্রথম মুরাদ খোদাওয়ান্দগার (মুরাদুল্লাহ) ৩১
প্রথম কবি : বজ্র বায়জিদ ৩৫
কুস্তিগির সুলতান : প্রথম মুহাম্মদ (চিলবি) ৩৯
প্রজ্ঞাবান সুলতান : দ্বিতীয় মুরাদ ৪৩
মানচিত্রপ্রেমী সুলতান : মুহাম্মদ আল-ফাতিহ ৪৯
তিরন্দাজদের উস্তাদ : দ্বিতীয় বায়জিদ ৫৬
উসমানীয় ওয়াহদাতুল উজুদ : সুলতান সালিম আল-জাব্বার ৬৩
যতদিন তরবারি থাকবে কোষমুক্ত... ৬৯
কবি ও হস্তশিল্পী : সুলতান সুলায়মান আল-কানুনি
(সুলায়মান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট) ৭১
জেদ্দায় যেন পানি পৌঁছানো হয় ৭৮
সিগেৎভার থেকে কানুনির দোয়ার আবেদন ৭৯
‘কৃষকরা উম্মতের নেতা’ : প্রবাদটি প্রকৃতপক্ষে আল-কানুনির ৮০
আল-কানুনি ও নুহ আ.-এর কিস্তি ৮০
‘সালিম’ নামটি যে সুলতানকে যোগ্য করেছে : দ্বিতীয় সালিম ৮২
সুলতানদের সুলতান যার অভিধানে ‘না’ বলে কিছু নেই : তৃতীয় মুরাদ ৮৭
চামচ কারিগর ও জহুরি : তৃতীয় মুহাম্মদ ৯৩
যার মনপ্রাণ জুড়ে শুধুই ঘোড়া : প্রথম আহমাদ ৯৬
চিরকুমার সুলতান : প্রথম মুস্তফা ১০১
চিরনবীন শাসক : দ্বিতীয় উসমান ১০৩

বাহিরে কঠোর, প্রাসাদে নম্র : চতুর্থ মুরাদ ১০৭
সুলতান ও গণক ১১৩
বীবরের যুগে আটটি বছর : সুলতান ইবরাহিম ১১৫
অদম্য শিকারি : চতুর্থ মুহাম্মদ ১১৮
রেকর্ডধারী যুবরাজ : দ্বিতীয় সুলায়মান ১২২
ইস্তাম্বুলে পদচিহ্ন না ফেলা সুলতান : দ্বিতীয় আহমাদ ১২৫
বৈশ্বিক ক্ষমতা থেকে আত্মমুগ্ধতা : দ্বিতীয় মুস্তফা ১২৮
যে সুলতান মেয়েলি কাজে মজে থাকতেন : তৃতীয় আহমাদ ১৩৩
উসমানি পাঠাগারের আলোকবর্তিকা : প্রথম মাহমুদ ১৩৯
জীবন্ত কবরস্থ ১৪৩
অগ্নিকাণ্ডের সুলতান : তৃতীয় উসমান ১৪৪
তারকায় নিবিষ্ট চোখ যুগল : তৃতীয় মুস্তফা ১৪৮
ওলি (আল্লাহভীরু) সুলতান : প্রথম আবদুল হামিদ ১৫৪
লক্ষ্যভেদী তিরন্দাজ : তৃতীয় সালিম ১৫৯
সিংহাসনের আড়ালে অচেনা মুখ : চতুর্থ মুস্তফা ১৬৫
প্রবাল শিল্পী, চিত্রানুরাগী ও স্বাস্থ্যসচেতন : দ্বিতীয় মাহমুদ ১৬৭
দুদু এফেন্দি ও জোহান স্ট্রাউসের পৃষ্ঠপোষক : সুলতান আবদুল মাজিদ ১৭৪
ইউরোপে জমজম প্রেরণকারী সুলতান : আবদুল আজিজ ১৮৩
৯৩ দিনের উন্মাদনাচক্র : পঞ্চম মুরাদ ১৯০
বৃক্ষের ভাষা বুঝতেন যে সুলতান : দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ১৯৩
চানাক্কালে দুর্গের কবি ও সুলতান : পঞ্চম মুহাম্মদ রাশাদ ২০৫
এটা বিপর্যয় : ষষ্ঠ মুহাম্মদ ওয়াহিদুদ্দিন ২১০
মুকুট বিহীন প্রথাগত সুলতান : খলিফা আবদুল মাজিদ ২১৩

সুগুতে নবজাতকের কান্না

গাজি উসমান

[শাসনকাল : ১২৯৯-১৩২৬]

“উসমান গাজি তাঁর শায়খ আবেদালীর দিক-নির্দেশনায় একের পর এক বিজয় লাভ করতে থাকেন”—এখান থেকে বুঝা যায় আবেদালী শুধু শায়খ ছিলেন না, ছিলেন উসমানের ভ্রাতৃপ্রতিম উপদেষ্টা। মমতা ও স্নেহ দিয়ে তিনি ধীরে-ধীরে উসমানকে রণক্ষেত্রের অলিগলি পরিচয় করিয়ে দিলেন। ফলে উসমান গাজি ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনা শুরু করলেন—খলিল ইনালজিক।

ইতিহাস পাঠে চৌকষ ও দূরদৃষ্টি প্রয়োজন। যেমন ধরুন, ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে উসমান গাজি জন্মগ্রহণ করেন। এই সালের কথা মনে হলে আপনার অনুসন্ধানী হৃদয়ে কি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উদয় হয়? সালটা সামনে এলেই কি চোখের সামনে কোনো ইতিহাস ভেসে উঠে? আমার মনে এই সালটা এতটাই অশুভ দাগ কেটে আছে যে, ওই সনেই মঙ্গোলিয়ানরা ইসলামি সভ্যতার বুক চিরে দখল করে নেয় সাম্রাজ্যের সিংহাসন। ১২৫৮ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারিতে মোঙ্গলরা জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয় মুসলিম সভ্যতার তিলে তিলে গড়ে তোলা জ্ঞানভান্ডার, ধ্বংস করে দেয় শত শতাব্দীব্যাপী পরিশ্রমের ফসল। ঠিক ওই সময়ে আনাতোলিয়ার উত্তরে তুর্কি বসতিতে আর্তগ্রুল বে’র

ঘরে এক নবজাতকের জন্ম হয়। যে নবজাতকের পরবর্তী প্রজন্মরাই অদূর ভবিষ্যতে মুসলিম বিশ্বের নুজ্ঞ হয়ে পড়া খুঁটিগুলো আবারও দাঁড় করাবে, যে খুঁটির জোর গত ছয় শতাব্দী যাবৎ নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল। যার এক জাগরণেই মানবসভ্যতা দেখতে পাবে ইতিহাসের সবচেয়ে সফল উত্থান, সফল বিপ্লব, সফল জাগরণ।

মঙ্গোলদের ধ্বংসলীলা ও উসমানের জন্মক্ষণের এই যে ঐকতান এটা স্রেফ কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়, বরং এর পেছনে ছিল খোদায়ি সমীকরণ। এটা শুধু বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী শায়খ আহমাদ ও ইসলামি চিন্তক সা'দ উদ্দিন এফেন্দির বক্তব্য নয়, বরং তাঁদের অনেক কাল পরে এসে আমিও এই মতটি সমর্থন করি। তা না হলে দেখুন, যদি সেই সঠিক মুহূর্তে উসমানি রাষ্ট্রভিতের আদলে মুসলিম বিশ্বের একতা পুনর্গঠিত না হতো ইসলামের পতাকা আবারও উড্ডীন হওয়ার ঐতিহাসিক সুযোগ তৈরি না হতো, তাহলে ১৯১৮ তে মুসলিম বিশ্ব যে লাঞ্ছনা ও বিভাজনের মুখোমুখি হয়েছিল তা আরও আগেই অর্থাৎ পঞ্চদশ কিংবা ষষ্ঠদশ শতাব্দীতেই দেখতে হতো।

প্রাসাদের চিত্রকর ইয়াহ্‌য়া বুসতানজাদা বেশ কিছুকাল পরে যে চিত্রটি এঁকেছিলেন সেখানে দেখা যায়—ইতিহাসের বৃহত্তর এক সাম্রাজ্যের রূপকার উসমান গাজি ছিলেন দীর্ঘকায়, শুভ্র বর্ণের ত্বক ও বাদামি ভ্রূর অধিকারী। কিন্তু জ্যোতির্বিদদের ইতিহাসে লিখা আছে তিনি ছিলেন বাদামি বর্ণের, উঁচু ভ্রূ ও গোলগাল চেহারার। চওড়া কাঁধের উসমান গাজি যখন দাঁড়াতেন তাঁর দুহাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছত।[১] এ থেকে বুঝা যায় হয় তাঁর হাঁটু ছিল খর্বকায় কিংবা দুহাত—স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘ। এ ধরনের দৈহিক গড়ন ছয় শতাব্দীকাল ধরে তাঁর বংশে খলিফা আবদুল মাজিদ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

শৈশবে উসমানকে বন্ধুরা 'বাদামি উসমান' বলেই ডাকত। জানা যায় তিনি অত্যন্ত সাধাসিধাভাবেই অপচয় ও অন্যায়বিহীন জীবনযাপন করেছেন। বিখ্যাত পদব্রাজক ইবনে বতুতা লিখেছেন, তাঁকে 'ছোটো উসমান' বলে ডাকা হতো। ১৩২৪ সালে সরকারিভাবে লিপিবদ্ধ ফারসি ভাষার নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে গাজি উরহানের উপাধি ছিল "শুজাউদ্দীন' আর তাঁর পিতা উসমানের উপাধি ছিল 'ফখরুদ্দীন'।[২]

উসমান গাজি আজীবন তাঁর মালিকানাধীন কিছু ছাগলের উৎপাদন (দুধ, দই, পনির ও মাখন ইত্যাদি) থেকে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। নতুন নতুন শহর জয়ের পর সেখানকার বাজারগুলো পরিদর্শন করতে গিয়ে বাজারের বাজ/ট্যাক্স গ্রহণের প্রস্তাব

---

[১] জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ শায়খ আহমদ, *তারিখু কাবিরিল কালাকিনীন (সহাইফুল আখবার ফি ওয়াকিইল আসার)* ১ম খণ্ড। ইসমাইল ইরফান অনূদিত, ইস্তাম্বুল। তারিখ অনুল্লেখিত, তরজুমান ম্যাগাজিন আর্কাইভ, ১০০১ তম সংখ্যা। পৃষ্ঠা : ৬৯।

[২] ইসমাইল হাক্কি ওযোন চার্চলি রচিত '*ওয়াকফিয়াতু গাজি ওরহান বেগ*, ৭২৪ রবিউল আউয়াল' ৫ম খণ্ড, ১৯ তম সংখ্যা, আঙ্কারা ১৯৪১। পৃষ্ঠা : ২৮১।

তিনি কখনোই মানতে পারেননি। একইভাবে বিভিন্ন মোসাহেবি উপঢৌকনও তিনি গ্রহণ করার পরিপন্থী ছিলেন। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে, যা তাঁর প্রাপ্য নয় সেদিকে হাত বাড়ানোর ক্ষেত্রে উনি কতটা স্পর্শকাতর ও হুঁশিয়ার ছিলেন। এই নশ্বর জীবনের ঠুনকো চাহিদার পেছনে ছুটে না চলার দৃঢ় মনোবল প্রকাশ পায় তাঁর এই চরিত্রের মধ্যে।

তাঁর মৃত্যুর পরে রেখে যাওয়া সম্বলের মধ্যে স্বর্ণ ও রূপার উপস্থিতি না থাকাটা তাঁর খোদাভীতি ও অনাড়ম্বর জীবন সম্পর্কে ধারণা দিতে যথেষ্ট। ঐতিহাসিক নথিপত্র অনুযায়ী তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তির তালিকায় যা ছিল তাঁর কয়েকটি হচ্ছে—

- সেলাই করা একটি নতুন জামা যেটাকে বলা হতো “সরন্তুক তাকলাসি”।
- ঘোড়ার পাশে ঝুলিয়ে রাখার থলে যেটাকে তুর্কি ভাষায় “ইয়ানজাগি” বলা হতো।
- একটি লবণদানি।
- একটি কাঠের তলোয়ারের খাপ।[৩]
- লম্বা একজোড়া বুট জুতা।
- কয়েকটি উন্নতজাতের ঘোড়া।
- তিনটি ছাগল, যা মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য পালিত হচ্ছিল।[৪]
- কয়েক প্রস্থ দেনিযলি তুলার কাপড়।
- ঘোড়ার ঢাল।
- ইকশহীরের বুননে তৈরি কয়েকটি লাল পতাকা।
- তরবারি।
- তূণীর।
- বর্শা ও এরকম আরও কিছু যুদ্ধাস্ত্র।

---

[৩] তৎকালীন তরবারির খাপও অস্ত্রের মতো বহন করা হতো। কোমরের কাছে বেল্টের সাথে এটি ঝুলানো যেত। অথবা মাথার কাছে সাদা লোমের তৈরি থলেতেও রাখা যেত যেভাবে জেলিনাবিরা রাখতো। খাবার গ্রহণের সময় তা খুলে রাখা হতো, ব্যবহারের পর পরিষ্কার করতে হতো। পরে আবার সুবিধামতো জায়গায় বহন করা হতো। উগুজ আরিফানালি সংকলিত আল-ওয়াল কি তারিখিনা, ইস্তাম্বুল ১৯৭৩, মিল্লীত প্রকাশনী। পৃষ্ঠা : ৮-৯।

[৪] উল্লিখিত জিনিসগুলোর নাম নেওয়া হয়েছে আপেক পাশা জাদার তালিকা থেকে, দেখুন- নিহাত আতুনয় সংকলিত 'তারিখে আপেক পাশা উগলু', ইস্তাম্বুল ১৯২০, ওয়াযারাতুত তারবিয়াতিল কাউমিয়্যাহ প্রকাশনী। পৃষ্ঠা : ৪০।

উসমান বে'র ব্যক্তিগত ব্যাবহারিক জিনিসপত্রের বেশিরভাগ আজ অবশিষ্ট নেই। আক্ষরিক অর্থেই তিনি একজন 'গাজি' (যুদ্ধজয়ী) ছিলেন। তাঁর স্মৃতি বলতে অবশিষ্ট আছে একটি বড় বড় দানার কাঠের তাসবিহমালা, যা তিনি নিয়মিত ব্যবহার করতেন। আর বুরসা নগরীতে তাঁর সমাধিক্ষেত্রে দুটি তবলা ছিল, হিজরি দ্বাদশ শতকের শেষপর্যন্ত সেই তবলা দুটি সেখানে প্রদর্শনের জন্য ছিল। ওই তবলা দুটি উসমান গাজিকে তৎকালীন সেলজুক সুলতান উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।[৫] কিন্তু ১৮৫৫ সালে ছড়িয়ে পড়া "ছোটো কিয়ামত" নামের বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডে কাঠের সেই তাসবিহমালা ও তবলা পুড়ে যায়। তা না হলে সেই জিনিসগুলো হয়তো আজপর্যন্ত সংরক্ষিত থাকত।[৬]

মাঝেমধ্যে মনে প্রশ্ন জাগে, আচ্ছা! তাহলে উসমান গাজি কী পরিধান করতেন? উসমান গাজির প্রচলিত তেলচিত্রগুলো তাঁর পোশাক সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদানকারী মূল সূত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়। কারণ, সূত্রগুলো বলে তিনি অত্যন্ত সাধাসিধা পোশাক পরতেন। কিন্তু বিভিন্ন চিত্রকররা অন্যান্য উসমানি সুলতানগণ ক্লাসিক্যাল যুগে যেরকম জামা পরতেন তাঁকেও সেইরকম জামা পরিয়ে ছেড়েছে।

অষ্টদশ শতকের শেষদিকে সুলতানদের চিত্রমালা অঙ্কন প্রকল্পে চিত্রশিল্পী কনস্ট্যান্টি কবিদাগালী উসমান গাজিকে একইভাবে সুলতান সুলায়মান কানুনি ও তৃতীয় মুরাদের মতোই ক্লাসিক্যাল পোশাকে চিত্রায়ণ করেন। এমনকি উল্লিখিত সুলতানরাও কখনো এমন রংবেরং এর পোশাক তো পরেনইনি, বরং আনাতোলিয়ার প্রাসাদে চতুর্দশ শতকে এসে দুর্গ গড়ে তোলার আগপর্যন্ত কোনো সুলতানই এমন পোশাক ব্যবহার করেননি।

কিছু সূত্র থেকে জানা যায়, গাজি উসমান পাগড়িতে লাল বুনটের 'খোরাসানি' নামের লম্বা টুপি ব্যবহার করতেন। এর ওপর মোড়াতেন বর্ণিল সুতি দিয়ে নকশা করা সফেদ রুমাল। মধ্য এশিয়ার উইঘুর মুসলিমসমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাথায় এখনও এই ধরনের পাগড়ির চল দেখা যায়। তিনি চওড়া লাল কলার-বিশিষ্ট লম্বা জোব্বা বা আলখেল্লা পরিধান করতেন।

এখন আমরা এমন কিছু তথ্য যোগ করতে যাচ্ছি যা পাঠকমহলকে নড়েচড়ে বসতে বাধ্য করবে। স্তম্ভিত করে দেবে কিছুক্ষণের জন্য।

গাজি উসমান এক কাপড় দুইবার পরিধান করতেন না। এই কথাটি তাঁর সম্পর্কে এতক্ষণ জেনে আসা আপনাদের সব হিসাবনিকাশ উলটপালট দিচ্ছে। তিনি কি

---

[৫] আহমদ রাসেম রচিত *তারিখুল উসমানিয়িন মুসাওয়ারাত*, সংকলনে- ইসমত বরমকলস, ইস্তাম্বুল ১৯৩৮, ওয়াযারাতুত তারবিয়াতিল কাওমিয়্যাহ প্রকাশনী। পৃষ্ঠা : ৭-৮।

[৬] জিয়া নুর আকসুন রচিত *তারিখুনা মাসকুল মনাদি সালাতিনুল উসমানিয়িন* ইস্তাম্বুল ১৯৯৭, আল মা'রেফাহ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা : ১৭।

বিলাসিতা ও অপব্যয়ের জীবন থেকে যোজন-যোজন দূরে ছিলেন না?! জি, হ্যাঁ। কিন্তু দরিদ্র ও অভাবীদের প্রতি তাঁর অপরিসীম বদান্যতার প্রেক্ষিতে কথাটি প্রচলিত হয়ে যায়।[৭] যখনই কেউ তাঁর পোশাকের দিকে একটু মনোযোগ দিয়ে তাকাত সাথে সাথে তিনি সেই পোশাকটি খুলে তাঁকে উপহার দিতেন। শাসক হওয়ার আগেও তিনি অসহায় বস্ত্রহীনদের কাপড় দান করতেন, বিশেষ করে বিধবাদের ব্যাপারে খুব বেশি সদয় ছিলেন।

সেসময় একটি গোত্রীয় রেওয়াজ ছিল, 'খিজির-ইলিয়াস'[৮] দিবসে গোত্রপ্রধান তাঁর বাড়ির দরজা সবার জন্যে উন্মুক্ত করে দিতেন। গোত্রপ্রধান স্রেফ তাঁর পরিবারকে নিয়ে খালি হাতে বাড়ি ত্যাগ করতেন, এমনকি একটা পেরেকও সাথে নিতেন না। বাড়ি ত্যাগের পরেই গোটা এলাকাবাসী সেই ঘরে প্রবেশ করে নিজেদের চাহিদা মতো যা ইচ্ছা নিয়ে যেত। এই প্রথার নাম ছিল 'গোত্রনেতার বাড়ি উন্মোচন' বা 'গোত্রপ্রধানের বাড়ি নিষ্কাশন'। গাজি উসমান এই প্রথাটি বেশ পরিকল্পনার সাথেই পালন করতেন। বছরে একদিন তিনি তাঁর মালামালভরতি বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেন গোত্রবাসীদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে। এই প্রথার ধারণা থেকেই পরবর্তীতে কবি তাওফিক ফিকরাত 'কমিটি অফ ইউনিয়ন এন্ড প্রোগ্রেস' নামক সংগঠনের দেশ লুটপাট দেখে "প্রধানের বাড়িলুট" শিরোনামে একটি বিদ্রুপাত্মক কবিতা লিখেন।[৯]

গাজি উসমান প্রথম উসমানি শাসক হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু তিনি সুলতান ছিলেন না। তাঁর উপাধি ছিল 'গাজি' ও 'বে'। আমাদের কাছে এমন এক অনবদ্য কবিতা আছে যার রচয়িতা হিসেবে গাজি উসমানকে ধরে নেওয়া হয়। যার শুরু-শেষ বীরত্ব আর প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশে ভরপুর। এর লেখক আদতেই গাজি উসমান কিনা এই প্রশ্ন তোলা যায়, কিন্তু এর চেয়ে বড় যে প্রশ্নটি তাঁকে এর লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে তা হলো—কেন এই কবিতাটির লেখক হিসেবে আর অন্য কোনো সুলতানের নাম উঠে আসেনি?!

আসুন, গাজি উসমানের সেই বিখ্যাত কাব্যের কিছু অংশ আবৃত্তি করে নেওয়া যাক—

> হৃদয়ের বুনট দিয়ে গড়ো শহর-নগর, নতুন নতুন হাটবাজারে খুশিমনে
> চলুক বিকিকিনি, কিন্তু চাষিদের ওপর করো না অত্যাচার। বলেদি আর নয়া

---

[৭] বদী শাহলওয়ার উগলু রচিত *আল-আইয়াতুল আখিরা ফি সালাতিনিল উসমানিয়িন* তারিখে তুর্কি ম্যাগাজিন। ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৩৮। পৃষ্ঠা ৩৫।

[৮] মে মাসের ষষ্ঠ দিবসটি তুর্কি সংস্কৃতিতে এই নামে পরিচিতি যা 'খিজির' ও 'ইলিয়াস' আলাইহিস সালামের নামে নামাঙ্কিত। কথিত আছে এই দিনে খিজির ও নবি ইলিয়াস আলাইহিস সালাম সাক্ষাৎ করেছিলেন।—অনুবাদক

[৯] তাওফিক ফিকরত রচিত *হালিদাতুল মুতাহালিকিন, ওয়াল আ'নাতুল কামিলা* কথারি ওয়ান সংকলিত। ইস্তাম্বুল ১৯৭৩, দারুল ইনকিলাব ওয়াল আনকা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা : ৩৬-৩৭।

> শহর ইনেগোলের দিকে তাকাও, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, বুরসা গুঁড়িয়ে দিয়ে আবার বানাও—যেখানে আমি কাফেরদের গুঁড়িয়ে দিয়েছি। বাঘ হয়ে ঢুকে পড়ো মেষপালে, সিংহের মতো বিজয় ছিনিয়ে আনো। সমাজের জন্য কিছু একটা করো, সেনানী হও, জিবের লাগাম টানো। ইযনিক নগরে লুকিয়ে থেকো না, সাকারয়া নদীর মতো ফুঁসে উঠো না। বরং ইযনিক জয় করে নাও, এর প্রতিটি প্রাসাদকে দুর্গ বানাও। তুমি কারা খান ও উগুজের বংশধর আর্তুগ্রুলের সন্তান উসমান। তোমার অধিকার ছিনিয়ে নাও, ইস্তাম্বুল জয় করে গড়ো গোলাপ বাগান।

ইতিহাসের প্রতিটি সূত্র থেকে প্রতীয়মান হয় গাজি উসমান ছিলেন অল্পতুষ্ট ব্যক্তি। দান করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন, কিছু গ্রহণ করতে অসম্মতি জানাতেন। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অভাবীদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। উদাহরণত স্মরণ করা যেতে পারে, তিনি প্রতিদিন আসরের পরে তাঁর প্রাসাদে অবস্থানরত প্রত্যেককে নিজ উপস্থিতিতে আপ্যায়ন করতেন। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সেই খাবার গ্রহণের আগে সুললিত সুরের আসর বসত। (উসমানীয়রা খাবার গ্রহণের সময় না, বরং খাবার গ্রহণের আগে সুর-সঙ্গীতের আয়োজনকে প্রাধান্য দিত)। বে'দের রীতি মেনে সেলজুক সুলতান আলাউদ্দীন যে মেহতার দল উপহার দিয়েছিলেন—গাজি উসমান তাদেরকে বাদ্য বাজানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বাদক দলটি খাবার গ্রহণ শুরু হলে বাজনা থামিয়ে দিত।[১০] গাজির সেই নিয়মিত খাবার আয়োজনের আরও একটি বিশেষত্ব ছিল, ধনী গরিব নির্বিশেষে সকলেই সেখানে খেতে বসতে পারত। এমনকি সেই দস্তরখানে মুসলিম-খ্রিষ্টানের সমান স্থান ছিল।

উসমান গাজির মতো বীরপুরুষের জীবনীতে লড়াই-কুস্তির উল্লেখ থাকবে না তা কী করে হয়?! ইতিহাসবিধৌত সূত্রগুলো তাঁর এই দিক নিয়ে ভরপুর। তিনি ছিলেন মল্লযুদ্ধ ও কুস্তিতে অতুলনীয়। অস্ত্র চালনায় ছিলেন ঈর্ষণীয়।

উসমান গাজি তাঁর শ্বশুর শায়খ আবেদালীর মৃত্যুর তিন কি চার মাস পরে ইন্তিকাল করেন। আরও দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, আবেদালীর কন্যা স্ত্রী মালহুন খাতুনের মৃত্যুর দুই মাস পরেই গাজি উসমান ইন্তিকাল করেন। তিনি নিজ হাতেই বিলেচিক নগরীতে শ্বশুর ও স্ত্রীকে সমাহিত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রথম তাঁকে সুগুতেই দাফন করা হয়। পরে গাজি ওরহানের সিদ্ধান্তে তাঁর কবর বুরসাতে স্থানান্তরিত করা হয়। মৃত্যুপূর্বে লিখিত তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী এখন পর্যন্ত তাঁর কবর বুরসার তোপখানা গ্রামে রয়ে গেছে।

---

[১০] বদী শাহসওয়ার উগসু রচিত *আল আইসাতুল আবিদা ফি সালাতিনিস উসমানিয়্যিন* তারিখে তুর্কি ম্যাগাজিন। ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৩৮। পৃষ্ঠা : ৬৪।

“প্রিয় বৎস, আমি মারা গেলে আমাকে বুরসার সেই রুপালি গম্বুজের নিচে কবরস্থ করো” (তাঁর কবর সর্বশেষবার সুলতান আবদুল আজিজের সময়ে সংস্কার করা হয়, প্রথমবার নির্মিত কবরটি ১৮৫৫ এর ভূমিকম্পে সম্পূর্ণ ধ্বসে যায়)[১১] দ্বিতীয় আবদুল হামিদ সুগুতে তাঁকে প্রথমে দাফনকৃত স্থানে একটি সমাধিসৌধ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সম্ভবত গাজি উসমানের মৃত্যুর কারণ ছিল গেঁটেবাত বা আর্থ্রাইটিস।[১২] গেঁটেবাত উসমানি শাসকগোষ্ঠীর বংশগত রোগ ছিল। গাজি উসমানের অন্তিমকালের বর্ণনা দিতে গিয়ে আশেক পাশা জাদা বলেন, “উসমানের পায়ে একটা ক্ষত ছিল, যার দরুন প্রচুর যন্ত্রণা হতো।[১৩] একই লেখক সুলতান আল-ফাতিহের মৃত্যুর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে একই ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছেন—তাঁর মৃত্যুর কারণ ছিল তাঁর পায়ের ক্ষত।”[১৪] সুতরাং গাজি উসমানের মৃত্যুর পেছনে আমরা তাঁর নাতি মুহাম্মদ আল-ফাতিহের মতোই ধরে নিতে পারি গেঁটেবাতের সাথে আর্থ্রাইটিসের ভূমিকা ছিল।

উসমানি সাম্রাজ্যের জনকের অজানা দিকগুলির বিস্তারিত উদ্ধার সম্ভব না হলেও এখানে আমরা এই ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্বের বর্ণিল জীবনের বেশ কিছু চমকপ্রদ ঘটনার সম্মেলন ঘটিয়েছি, যা পাঠকের তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের খোরাক হবে।

* * *

---

[১১] পড়তে পারেন আমার লিখিত গ্রন্থ—*বাদাইয়িয়া ফি বাদিয়াতি বুরসা*, ইস্তাম্বুল ১৯৯৮ এ প্রকাশিত এই গ্রন্থে উসমান গাজির প্রথম কবরের চিত্রায়ণ রয়েছে। এর দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৩ সালে তিমাশ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে *আল-বাদিয়াতুল মুআসসাসা লিল উসমানিয়্যিন বাদাইয়িয়া ফি বুরসা*, শিরোনামে। তাঁর পাশে সমাহিত গাজি ওরহানের প্রথম কবরও আমাদের কাছে সংরক্ষিত নয়। তাঁর বর্তমান কবরটিও সুলতান আবদুল আজিজের সময়ে সম্পূর্ণ করে নির্মিত হয়।—লেখক।

[১২] *আল-দামতুন*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৭৩।

[১৩] আশেক পাশা উগলু রচিত ইতিহাস। পৃষ্ঠা : ৩৫।

[১৪] আশেক পাশা উগলু রচিত ইতিহাস। পৃষ্ঠা : ২৩৪।

সংশপ্তক : ওরহান গাজি

[শাসনকাল : ১৩২৬-১৩৬১]

ওরহান দেড় শতাব্দী ধরে সমস্ত সুলতানদের এক প্রেরণাময় উদাহরণ—আহমাদ হামদি তুনবানার।

উসমানীয় ইতিহাসে প্রাজ্ঞ লেখক ইদরিস আল-বিতলিসি তাঁর লিখিত ফারসি “হাশত বেহেশত”[১৫] গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে দাবি করেছেন—উসমানি রাষ্ট্রের প্রকৃত স্থপতি হলেন গাজি ওরহান। অন্যদিকে উসমানি ইতিহাসবিশারদ খলিল ইনালজিক, উসমানীয় ইতিহাসের চুলচেরা বিস্তারিত যার নখদর্পণে, তাঁর দাবি গাজি ওরহান “সুলতান” উপাধি ধারণকারী প্রথম উসমানি শাসক। আর উসমানি সাম্রাজ্যের শেষ ঐতিহাসিক আবদুর রহমান শরফ বেগ’র ভাষায় ওরহান ছিলেন এক কথায় “সংশপ্তক”, যিনি তাঁর পিতার শুরু করা ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রথম একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলার মূল কারিগর ছিলেন, আনাতোলিয়ার উপত্যকায় ঘুরে বেড়ানো যাযাবর সমাজকে সফলভাবে এমন একটি রাষ্ট্রে রূপদান করেছিলেন যা তাঁর ন্যায়পরায়ণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শাসন করেছিল একযোগে এশিয়া ও ইউরোপ।

---

[১৫] অর্থাৎ আট সুলতান বা আট জান্নাত— অনুবাদক

মহান স্থপতি পরিচয়ের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে তাঁর বিনয়ী স্বভাব; যা তিনি তাঁর সৎভাই আলাউদ্দীন বে'র নানা শায়খ আবেদালীর সাহচর্য থেকে পেয়েছিলেন, আর তাঁর পিতা থেকে পাওয়া বজ্রকঠিন সংকল্প। তাঁর শুভ-শুভ্র সততা, তাঁর ভাই আলাউদ্দীন[১৬] থেকে পাওয়া নম্রতা, স্পষ্টবাদিতা, তাঁর বরকত ও নিরাপত্তা চেয়ে চোখের পানি ফেলা আলেমদের দোয়া ইতিহাসের আড়ালে রয়ে গেছে।

গাজি ওরহানকে স্মরণ করা হয় উসমানীয়দের তৃতীয় সুলতান হিসেবে। তিনি ছিলেন সবচেয়ে দীর্ঘকাল শাসন করা সুলতান—যার ব্যাপ্তি ছিল টানা ৩৬ বছর। ইতিহাসের সূত্রগুলো জানাচ্ছে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী, প্রভাবশালী ও রাশভারী চেহারার অধিকারী। তিনি ছিলেন গোলাপি আভা মিশ্রিত ফর্সা ত্বকের অধিকারী। চাপ দাড়ির ফ্রেমে তাঁর ভ্রূ-জোড়া ছিল অর্ধচন্দ্রাকার ধনুকের ন্যায়। সুদীর্ঘ দৈহিক গড়নে প্রশস্ত কাঁধজোড়া ছিল অত্যন্ত সুঠাম। টানটান চোখের নিচে তাঁর নাকটি ছিল মেষের নাকের মতো। রোমান ইতিহাসবিদ চাল্কোকোন্ডালিস উল্লেখ করেছেন, "গাজি ওরহান ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও নম্র স্বভাবের। তিনি ছিলেন ভীষণ দয়ালু, বিশেষ করে বিজেতা, শিল্পী ও অসহায়দের প্রতি"। ঐতিহাসিক নাশরিফ বর্ণনা করেছেন—"তিনি আলেমসমাজ ও কুরআনের হাফেজদের প্রচণ্ড ভালোবাসতেন, তাঁদের জন্য বিশেষ ভাতা চালু করেছিলেন যা উসমানীয়দের ভাষায় "উলফাহ" নামে পরিচিত ছিল"।

উসমানি সালতানাতের জন্য নিরাপদ ভিত গড়ার পেছনে গাজি ওরহানের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি 'ইয়ানি হাসসার' এর খ্রিষ্টান গভর্নরের কন্যা নিলুফারকে বিয়ে করেছিলেন। এ পক্ষের স্ত্রী থেকে জন্ম নিয়েছিল মুরাদ। এ কারণে বলা হয় উসমানি রাজপরিবারের অধিকাংশই নিলুফারের বংশ থেকে।[১৭]

নিলুফারের সাথে তাঁর বিবাহের বিষয়টি সামনে রাখলে আমরা একটি চমকপ্রদ বিবাহনীতির দেখা পাই। গাজি ওরহান যখন নিলুফারের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তখন তাঁর বয়স ছিল এগারো কি বারো বছর, অন্যদিকে নিলুফার ছিলেন তাঁর চেয়ে পাঁচ অথবা ছয় বছরের বড়ো। অতএব, বলা চলে তাঁকে বিয়ে করাটা নিলুফারের

---

[১৬] কিছু সূত্রমতে, আলাউদ্দীন বে' তাঁর সৎ ভাই, আবার এই সম্ভাবনাও প্রবল যে তারা একই মায়ের সহোদর। দেখুন-আবদুল কাদের উযজন রচিত "আলাউদ্দীন বে", তুর্কি দীনি ওয়াকফ থেকে প্রকাশিত ইসলামিক এনসাইক্লোপিডিয়া। ২য় খণ্ড, ইস্তাম্বুল ১৯৮৯। পৃষ্ঠা : ৩২০। ভবিষ্যৎ উসমানি শাসকগোষ্ঠী নির্ধারণে একটি উল্লেখজনক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি ওরহান থেকে বয়সে বড়ো হওয়া সত্ত্বেও সিংহাসনে বসতে অস্বীকৃতি জানান। তাই এটাই পরিষ্কার যে, উসমানীয় শাসকগোষ্ঠীর সবাই ওরহানের ঔরস থেকে, আলাউদ্দীন থেকে নয়। বুরসা নগরীতে তাঁর নামে একটি জুমা মসজিদও আছে।

[১৭] কিছু গবেষণাপত্র ইঙ্গিত করে বেলজিয়াম থেকে আগত সেই কনে নিলুফার (হেলোফেরা) ছিল না, বরং ওরহানের অন্য একজন প্রথম দিকের স্ত্রী ছিল। নিলুফার ছিল প্রাসাদে আনা হেরেমের এক দাসীর নাম। দেখুন- The Imperial, Leslie P. Peirce, P: 34, 1993, Harem, Oxford University Press.

জন্য—অন্তত প্রথমদিকে তো বটেই শুধু আনুষ্ঠানিকতা পালন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এ কারণে, যেমনটা রশিদ আকরাম কুতশু বিশ্বাস করেন যে, একটি এগারো-বারো বছরের বালকের সাথে ষোলো বছরের কিশোরীর 'দৈহিক ভালোবাসা' গড়ে উঠাটা প্রায় অকল্পনীয়।

তাঁর বিবাহ-ইতিহাসের আরও একটি চমকপ্রদ দিক হলো, বাইজান্টাইন সম্রাট ইওয়ানিস ক্যান্টাকোযিনের কন্যা থিওডোরার সাথে রাজনৈতিক কারণে বিবাহবন্ধ হওয়া। (ইসমাইল হাক্কি ওযোন চার্চলি'র মতে, এই বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে[১৮])। এই বিয়ের ফলে, উসমানীয়দের পাঁচ হাজার সৈন্য বাইজান্টানের সরাসরি অধীনে চলে যায়। ঘটনাপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়, এই বিয়ের ওপর বাইজান্টাইনের পক্ষ থেকে আরও একটি শর্ত ছিল—তাঁর স্ত্রী যখনই পিতৃভূমিতে বেড়াতে যেতে চাইবেন গাজি ওরহান তাঁকে যেতে দেবেন। এর সপক্ষে আমরা ঐতিহাসিক নথিপত্রে বেশ কিছু প্রমাণ পাই। যেমন, গাজি ওরহান ১৩৪৭ সালে স্ত্রীকে নিয়ে ইস্তাম্বুলের উস্কুডার বন্দরনগরীতে আসেন, সেখানে তাঁর সেনাবাহিনী সবুজ জমিনের ওপর লাল গালিচা বিছিয়ে অভ্যর্থনা জানায় (সময়টি বসন্ত কিংবা গ্রীষ্ম ছিল)। অন্যদিক থেকে বাইজান্টাইন সৈন্যরা দ্রুতগতির বোটে করে "মেইডেন্স টাওয়ার" এর কাছে আসে। তারা থিওডোরাকে সাথে করে তাঁর পিতার প্রাসাদে পৌঁছে দেয়। বেশ কিছুদিন সেখানে কাটার পর তারা থিওডোরাকে আবারও মেইডেন্স টাওয়ারের সন্নিকটে পৌঁছে ওরহান বে'র সেনাদলের কাছে হস্তান্তর করে।

♣♣♣

থিওডোরার বাসর হয় সিলিভ্রি প্রদেশে। উসমানি নৌবহর সেখানে কনে নিতে আসে। এরপর মৌদানিয়া হয়ে তারা বুরসা পৌঁছায়। "হিসার" এ ওরহান বে'র প্রাসাদ পর্যন্ত শোভাযাত্রা অব্যাহত থাকে।[১৯]

♣♣♣

নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমাদের জানতে খুব ইচ্ছে হয়, গাজি ওরহান চিত্তাকর্ষক শিল্পকলায় মুগ্ধ হতেন কি না?! এর উত্তর পেতে বেশিদূর যাওয়ার প্রয়োজন নেই, প্যারিসের

---

[১৮] ইসমাইল হাক্কি ওযোন চার্চলি রচিত *'ওয়াকফিয়াতু গাজি ওরহান বে'* পৃষ্ঠা : ২৬৭।

[১৯] দেখুন, জামাল কুবান উগলু রচিত *সাওয়াজু থিওডোরা ওয়াল গাজি ওরহান ফি সিলিভ্রি*, সামাজিক ইতিহাস ম্যাগাজিন, সংখ্যা : ১১, নভেম্বর ১৯৯৪, পৃষ্ঠা : ২৭-২৯। আরও দেখুন- খলিল ইনালজিক রচিত *আস-সালাতিনুল উসমানিয়্যুন ফি মারহালাতিত তা'সিস*, (১৩০২-১৪৮১), ইস্তাম্বুল ২০১০, মনশুরাত ইসাম, পৃষ্ঠা : ৫৪।

বিখ্যাত সুভর জাদুঘরে তাঁর নামখচিত ফুলেল শিল্পকর্মের বিভিন্ন নিদর্শন এখনও সংরক্ষিত আছে। যা গাজি ওরহানের গভীর শিল্পপ্রেমের প্রমাণ।[২০]

বিখ্যাত মরোক্কান পর্যটক ইবনে বতুতা যিনি ব্যক্তিগতভাবে গাজি ওরহানের সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছিলেন—তিনি তাঁর সম্পর্কে আমাদের জানাচ্ছেন—"তুর্কিমিন সুলতানদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট", "রাজভূমি, সেনাদল ও প্রাচুর্যের দিক থেকে তিনি ছিলেন সকল সুলতানদের থেকে এগিয়ে"। ইবনে বতুতার বিবেচনায়, ওরহান যে একশটি দুর্গ পরিচালনা করতেন। তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত সেসব দুর্গ পরিদর্শন করে। ইবনে বতুতা বলছেন—'বর্ণিত আছে, তিনি এক নগরীতে এক মাসের বেশি অবস্থান করতেন না, শত্রুদের ওপর অনবরত ঝাঁপিয়ে পড়তেন, একের পর এক শত্রুদের দুর্গ অবরোধ করে রাখতেন এবং দখলে নিতেন।'

যে কাজটাতে তাঁর অন্তর সবচেয়ে বেশি প্রফুল্ল হতো তা হচ্ছে, তাঁর নির্দেশে নির্মিত জুমা মসজিদসমূহে আলোর ব্যবস্থা করতে পারা। আর প্রাসাদে গরিব দুঃখীদের জন্য রান্না করা খাবার নিজ হাতে তাঁদেরকে পরিবেশন করা।[২১] অন্যদিকে ইতিহাস লেখক তুনবানার ওরহান গাজির মৌলিক বিশেষত্ব হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়টি তুলে ধরেছেন—

"তাঁর মূল গুণ হলো, তিনি শুধু সাম্রাজ্য সৃষ্টির পেছনে লেগে থাকতেন না, বরং তাতে ঢেলে দিতেন তাঁর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও দয়ার সংমিশ্রণ"।[২২]

ইয়াহিয়া বুস্তানজাদা'র লিখিত গ্রন্থ *আত-তারিখ আস-সাকি* অনুযায়ী, গাজি ওরহান নিয়মিত সোম ও বৃহস্পতিবারে রোজা রাখতেন। তিনি পশমের পাগড়ি ব্যবহার করতেন, এর ওপর জালালুদ্দীন রুমীর অনুকরণে সাদা রুমাল প্যাঁচাতেন।[২৩] কিছু সূত্র অনুযায়ী, তিনি পাগড়ি পরতেন পশুর শুভ্র চামড়ার টুপি দিয়ে।

আসুন, গাজি ওরহানের প্রকৃতি অনুধাবনের চেষ্টা করা বহুমাত্রিক মেধার অধিকারী আহমাদ হামদি তুনবানারের আরও কিছু উপলব্ধি জানা যাক। কবি ইউনুস ইমরার দুডানায় ভর করে গাজি ওরহানের সফলতার দিকে উড়ে চলার সমীকরণটি কীভাবে এই চৌকশ লেখকের চোখ খুঁজে নিয়েছে দেখুন—

---

[২০] দোগান কুবান রচিত "*Turkish Culture & Arts*", ইস্তাম্বুল ১৯৮৩, আনাতোলিয়া ব্যাংক প্রকাশনী, পৃষ্ঠা : ১১৯।

[২১] ইয়াহিয়া আফেন্দি বুস্তানজাদা লিখিত "*আত-তারিখুস সাকি/তুহফাতুল আহবাব*", নাজদাত সাফ্ফা উগলু সংকলিত। ইস্তাম্বুল ১৯৭৮, মিল্লীত প্রকাশন, পৃষ্ঠা : ৩১।

[২২] আহমদ হামদি তুনবানার রচিত *গনসু গুলু*, দ্রষ্টব্য, ইস্তাম্বুল থেকে ১৯৮৮ সালে জাতীয় শিক্ষার মুদ্রণালয় থেকে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা : ১১৪-১৫।

[২৩] "*উসমানি সুলতানদের শৌখিনতাগুলি ও মৃত্যু*", বদী শাহনওয়াজ উগলু রচিত, তুর্কি তথ্যনির্ভর ইতিহাস ম্যাগাজিন, সংখ্যা- ৫, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮, পৃষ্ঠা : ৪৮।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলার পেছনে গাজি ওরহান প্রমুখ ও কবি ইউনুসের ভূমিকায় আমি কোনো তফাত দেখি না, যতবার আমি গাজি ওরহানের দিকে তাকাই সেখানে আমি কবি ইউনুসের কাব্যচিত্রের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। সমস্ত বিজয়ের পেছনে থাকা তুর্কি ভাষা প্রসূত ও মূল্যবোধ বিধৌত এই আলোকবর্তিকাকে জানাই হাজারো সালাম।

* * *

মাওলানা জালালুদ্দিন অনুরাগী
প্রথম মুরাদ খোদাওয়ান্দগার (মুরাদুল্লাহ)

[শাসনকাল : ১৩৬১-১৩৮৯]

এক রাতে স্বপ্নে এক নুরানি—আলোকজ্জ্বল চেহারার ব্যক্তি এসে তাঁকে বললেন, আদির্নাতে একটি দুর্গ নির্মাণ করো। সেই সাথে তিনি দুর্গের সীমানা দেখিয়ে দিলেন। পরদিন সকালে গাজি খোদাওয়ান্দগার রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে দেখানো স্থানটি খুঁজে পেলেন, অতঃপর সেখানে একটি অজেয় দুর্গ নির্মাণের আদেশ দিলেন। শহরটিকে পরিণত করলেন সাম্রাজ্যের মূল কেন্দ্রে—শায়খ আহমাদ জ্যোতির্বিদ।

ইতিহাস জানায়, উসমানীয় সুলতানদের বেশ কয়েকজন, বিশেষ করে প্রথম দশজন সুলতান নিজেদেরকে সরাসরি সেনা প্রশিক্ষণের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। পরবর্তীদের মধ্যে দ্বিতীয় উসমানও এমনটাই ছিলেন যার উপাধি ছিল—"চির নবীন"। আর চতুর্থ মুরাদ ও দ্বিতীয় মুস্তফার মতো সুলতানরা তো সরাসরি যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেছেন। সুদক্ষ সেনাপতির মতো যুদ্ধের ময়দান থেকে বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন, সফলভাবে সমাধান করেছেন দুর্গ অবরোধের মতো জটিল সব রণ-সমস্যা। নিঃসন্দেহে যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসী নৈপুণ্য প্রদর্শনের পাশাপাশি রণকৌশলের নিখুঁত ছক আঁকতে পারে এমন একজন সেনাপ্রধান পাওয়া দুঃসাধ্য বটে। তারপরেও আমরা প্রথম দশজন উসমানীয়

সুলতানদের মধ্যে মেধা ও দক্ষতার এমন বিরল গুণের সম্মিলন দেখতে পাই, যেন তারা উত্তরাধিকার সূত্রেই এই নৈপুণ্যের অধিকারী হয়েছিলেন।

বিশেষ করে ক্ষমতাসীন পরিবারের মধ্যে এমন সুযোগ্য সেনাপতি উঠে আসার মতো পরিবেশ থাকে না। উসমানীয় শাসকপরিবারের মধ্য থেকে লাগাতার এমন সুলতানদের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর ঘটনা ছাড়া আর কিছু না।

এই প্রথম দশজন সুলতানদের মধ্যে তিনজন রণক্ষেত্রে শহিদ হয়েছেন। তারা হলেন—প্রথম মুরাদ, মুহাম্মদ আল-ফাতিহ ও সুলায়মান আল-কানুনি। তবে শেষ দুজন যুদ্ধ চলাকালীন ইন্তিকাল করলেও শত্রুর সংস্পর্শে ছিলেন না। মামলুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় মারা যাওয়া মুহাম্মদ আল-ফাতিহর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ছিল সম্ভবত দীর্ঘদিন ধরে ভুগতে থাকা আর্থ্রাইটিস অত্যধিক বেড়ে যাওয়া। তবে এর পাশাপাশি তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে এমন দাবিও রয়েছে।

⁂

অন্যদিকে সুলায়মান আল-কানুনি মারা যান সিগেতভারে যুদ্ধরত অবস্থায়। কিন্তু তিনিও অসুস্থ ছিলেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতির দরুন তিনি মারা যান। সবশেষে প্রথম মুরাদই একমাত্র সুলতান যিনি যুদ্ধ করতে করতে নিহত হন।

বর্ণনাসূত্র অনুযায়ী, প্রথম মুরাদ ছিলেন পেটানো দেহের অধিকারী। লম্বা ঘাড় আর গোলগাল চেহারায় তাঁর দেহসৌষ্ঠব ছিল খুব মানানসই। তাঁর নাক ছিল বড়ো (অনেকটা মেষের নাকের মতো দেখতে)। বিস্তৃত চোখ আর তার ওপর ঘন ভ্রূ-জোড়া যেন টানটান বাঁকানো ধনুক। তিনি ছিলেন বাজপাখির মতো দৃষ্টির অধিকারী। দাঁতগুলো ছিল আকৃতিতে বৃহৎ ও ফাঁকফোকর সর্বস্ব। চওড়া বুক। দাড়ি মধ্যম পরিধির দীর্ঘ ছিল। তবে বিস্ময়করভাবে তাঁর হাতের আঙুল ছিল লম্বা ও মোটা, প্রচণ্ড শক্তিশালী ও ফাঁকা ফাঁকা। (বলা হয়, তাঁর চিঠিপত্রে মোহর হিসেবে তাঁর আঙুলের ছাপ ব্যবহার করা হতো)। তাঁর কণ্ঠের আওয়াজ এতটাই বলিষ্ঠ ছিল যে যুদ্ধের ময়দানেও অনেক দূর থেকে তাঁর দরাজ গলা শোনা যেত।

উসমানীয় সূত্রগুলো প্রথম মুরাদ সম্পর্কে ভালো ও মহৎ বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় ভরপুর। কিছু পাশ্চাত্য সূত্র অনুযায়ী তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী। মিতভাষী হলেও তাঁর বক্তব্য ছিল অলংকারপূর্ণ। তিনি ছিলেন “কল্যাণকামী শাসক, ক্লান্তিহীন শিকারি ও দ্রুতগামী অশ্বারোহী”। দিমিত্রি কান্তমিরের ভাষায় তিনি ছিলেন “দৃঢ়তার প্রতীক”, তাঁর সংকল্প ছিল অপরাজেয়। তিনি দ্বীনি ফরজগুলো খুব দৃঢ়তার সাথে পালন করতেন। আলেমদের সাথে দ্বীনি আলোচনা করতে ভালোবাসতেন। তিনি সুফিদের পাতলা সস্তা চাদর

পরিধান করতেন, যা ধর্মীয় ব্যক্তি ও দরবেশদের পোশাক ছিল।[২৪] বর্ণিত আছে, জনগণ তাঁকে একজন আস্থাভাজন রক্ষক ও পিতাসম অভিভাবক হিসেবে খুব ভালোবাসত। এর সপক্ষে তাঁর 'খোদাওয়ান্দগার' উপাধিটি প্রমাণ হিসেবে আমাদের হাতেই রয়েছে। খলিল ইনালজিক বিশ্বাস করেন, তাঁর 'গাজি খোদাওয়ান্দগার' উপাধির পেছনে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সাহসিকতা ও সাম্রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণে সফলতার বলিষ্ঠ প্রমাণ।[২৫]

অন্যসব উসমানি সুলতানদের মতোই প্রথম মুরাদও শিকারে যেতে ভালোবাসতেন। ঐতিহাসিক নাশরিফ তাঁর শিকারপ্রীতি সম্পর্কে বলেছেন—তিনি শিকার অভিযান খুব উপভোগ করতেন, রুপার শেকল ও সোনার শেকলে বাঁধা তাঁর প্রশিক্ষিত শিকারি কুকুর ছিল। অনুরূপ তাঁর শিকারি বাজপাখিও ছিল।'

হামের নামক এক লেখক দাবি করেছেন 'প্রথম মুরাদ লেখতে ও পড়তে জানতেন না'। তার এ দাবি অমূলক। প্রমাণ করতে এটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি ছিলেন প্রথম উসমানি সুলতান যার ব্যক্তিগত পাঠাগার ছিল। এটা আমরা কি করে জানলাম?! তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারের সৌজন্যে পাওয়া বেশকিছু গ্রন্থের অনুলিপি পাওয়া যায়।[২৬]

সুলতান প্রথম মুরাদ মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর অবর্ণনীয় ভক্ত ছিলেন। তাঁর প্রতি গভীর অনুরক্তি থেকেই তিনি "খোনকার" ও "খোদাওয়ান্দগার" উপাধি লাভ করেন। এমনকি তিনি মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর পক্ষ হতে প্রেরিত এক প্রস্থ কাপড় দ্বারা স্বর্ণের সুতা দিয়ে একটি পাগড়ি বানানোর নির্দেশ দেন। আরেক টুকরো দিয়ে মুকুট বানিয়ে তার ওপর আরেক টুকরো কাপড় গোল করে প্যাঁচিয়ে পরিধান করতেন।[২৭] মাথার এই পরিধেয়গুলো বুরসা নগরীতে তাঁর কবরের পাশেই সপ্তদশ শতকের শুরু পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। এমনকি বেশ কয়েকজন উসমানি সুলতান সেই মুকুটটি তাঁদের অভিষেক অনুষ্ঠানে সাম্রাজ্য গ্রহণের প্রতীক হিসেবে মাথায় পরেছেন।

---

[২৪] দিমিত্রি কান্তেমীর রচিত ও উজদমীর চোবান উগলু অনূদিত *তারিখু সুউদিল ইমব্রাতোরিয়া আল উসমানিয়্যাহ ওয়া ইনহিতাতুহা*, আংকারা ১৯৭৯, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা : ৪৩।

[২৫] খলিল ইনালজিক রচিত, তুর্কি ধর্মীয় ওয়াকফ থেকে প্রকাশিত ইসলামি বিশ্বকোষ থেকে "*প্রথম মুরাদ*"। খণ্ড : ৩১, ইস্তাম্বুল ২০০৬, পৃষ্ঠা : ১৫৩।

[২৬] ইসমাইল হাক্কি ওযোন চারশিলি রচিত *আত-তারিখুল উসমানি* ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ইস্তাম্বুল ১৯৭৫। তুর্কি ভাষাকেন্দ্র প্রকাশনী। পৃষ্ঠা : ৪৯৭। আরও বিস্তারিত জানতে পড়ুন- *আলাদুত তারিখ* ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সুহাইল আনোয়ার এর প্রবন্ধ *নাকতাবাতুল কাতের আল-গাসসাহ*, বিশেষ আল-ফাতিহ্ সংখ্যা। মে ১৯৫৩। পৃষ্ঠা ৯-১০। আনোয়ারের মতে, প্রথম মুরাদ নিরক্ষর ছিলেন না (যেমনটা তাঁর বিভিন্ন চিঠিতে স্বাক্ষরের বদলে আঙুলের ছাপ ব্যবহার করার কারণে ধারণা করা হয়ে থাকে)। বরং তিনি জটিল জটিল আরবি গ্রন্থ পাঠ করতে পারার মতো জ্ঞানী ছিলেন, তাঁর নিজস্ব পাঠাগার ছিল।

[২৭] বলী শাহসওয়ার উগলু রচিত *আইজানুস সালাতিন আল-উসমানিয়্যীন আল-আবিয়া ওয়া নওতুহুন*, তারিখে তুর্কি ম্যাগাজিন। ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ, ১৯৬৮। পৃষ্ঠা ৭৯।

সুলতান মুরাদের পোশাকের রুচি থেকে জানা যায়, তিনি সাদা জামার ওপর লাল নকশাকৃত পোশাক পছন্দ করতেন। তাঁর নিত্যব্যবহৃত পাগড়ি ছিল স্বর্ণখচিত। যা প্যাঁচানো রুমালের নিচ থেকে প্রায় এক আঙুল পরিমাণ প্রকাশিত হতো।

গাজি উসমানের সময় থেকে চলমান ভ্রাতৃত্ব-নীতিতে আমরা নতুন অধ্যায় যোগ হতে দেখি সুলতান প্রথম মুরাদের শাসনামলে। ঐতিহাসিক ইসমাইল হাক্কি ওযোন চার্চলি'র বার্তা অনুযায়ী, সুলতান মুরাদ ছিলেন ভ্রাতৃত্ব-নীতির অনুঘটক ও নেতা।[২৮] বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হতে দেখি, সুলতানের পুত্র আমির বায়েজিদের সাথে আলি বেগ গরমিয়ান উগলুর কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রাপ্ত উপহার-সামগ্রীর কিছুই নিজের কাছে না রেখে নেতৃবর্গ, রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিবর্গ, উলামা ও গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার ঘটনা থেকে। এক রোজনামচা বর্ণনায় এসেছে, "আমি আমার ভাই মুসার কোমরে ওই বেল্ট পরিয়ে দিলাম যে বেল্টটা একটু আগে আমাকে আমার ভাইয়েরা পরিয়ে দিয়েছে"।[২৯]

সুলতান মুরাদ রুমলি (বলকান) বিজয় অভিযান পরিকল্পনায় সর্বাগ্রে রেখেছিলেন। এমনভাবে রণকৌশল সাজিয়েছিলেন যেন "আদির্না" সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিণত হয়। এবং আনাতোলিয়ার অন্যান্য অঙ্গরাজ্যে সামন্তনীতি যেন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ থেকে আমাদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে যায় এটাই ছিল উসমানি সালতানাত পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করার সর্বশেষ ধাপ।[৩০]

বুরসা নগরীর তোপখানা মহল্লায়, দুই গাজি উসমান ও ওরহানের কবরের একটু ওপর দিকে "শাহাদাহ" নামের একটি জামে মসজিদ আছে। বর্ণনাগুলো বলছে, "খোদাওয়ান্দগার" প্রথম মুরাদ তাঁর জীবনের শেষ নামাজটি এখানেই আদায় করেন। কসোভার যুদ্ধে যাওয়ার একটু আগেই তিনি সেই মসজিদে নামাজ আদায় করেন যে মসজিদটি তিনি ১৩৮৯ সালে নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তখনো সেই মসজিদের নাম ঠিক হয়নি। যখন তিনি যুদ্ধে শহিদ হলেন, দায়িত্বশীলদের অন্তরে মসজিদটির জন্য যে নামটি স্থির হলো তা হচ্ছে "জামে শাহাদাহ"।

* * *

---

[২৮] ইসমাইল হাক্কি ওযোন চার্চলি রচিত *মুকদ্দাতুল জাবাশির মদনি কি তাশকিলাতিদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, আংকারা ১৯৮৫। তুর্কি ভাষাকেন্দ্র প্রকাশনী। পৃষ্ঠা : ১৪৭।

[২৯] দেখুন- নজদত তুল্লা উগসু রচিত *মুরাদ আল-আওয়াল (খোদাওয়ান্দকার) মওসুআতু হায়াতিল উসমানিয়িন ওয়া আ'মালিহিম* ২য় খণ্ড, ইস্তাম্বুল ২০০৮। নির্মাণ ও ঋণ ব্যাংক "Yapi Kredi" কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা : ২৩৫।

[৩০] খলিল ইনালজিক রচিত প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা : ১৩৩।

প্রথম কবি : বজ্র বায়জিদ

[শাসনকাল : ১৩৮৯-১৪০২]

তিনি ছিলেন সামের[৩১] মতোই সুলতানদের সুলতান—আওলিয়া চিলবি।

পাঠক কি জানেন, বুরসার আকর্ষণের মূল কেন্দ্রবিন্দু “উলু চামি” মসজিদটি নির্মাণের পটভূমি কী? এই জামে মসজিদটি নির্মাণের পেছনে একটি চমকপ্রদ গল্প রয়েছে। সুলতান বায়জিদ একদিন মানত করে বসলেন, নাবলুসের যুদ্ধে যদি তিনি বিজয়ী হন তাহলে যুদ্ধলব্ধ গনিমত থেকে তিনি বিশটি মসজিদ নির্মাণ করবেন। তাঁর আশা পূরণ হলো। ফলে মসজিদগুলো নির্মাণের জন্য তিনি উপদেষ্টাদের নিয়ে জায়গা নির্বাচন করতে শুরু করলেন। প্রকল্প চালু হওয়ার কিছুদিন পর বজ্র বায়জিদ বুঝতে পারলেন মূলত বিশ বিশটি জামে মসজিদ নির্মাণ এখন সম্ভব না। ফলে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে এর একটা বিহিত চেয়ে পরামর্শ চাইলেন। তারা অনুসন্ধান করে দেখল, বায়জিদ মান্নত করার সময় মূলত “বিশটি গম্বুজ নির্মাণের” কথা উচ্চারণ করেছিলেন। সুতরাং তারা বায়জিদকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত দিলেন যে, যদি বিশ গম্বুজ-বিশিষ্ট একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয় তাহলে মানত পূরণ হয়ে যাবে। এভাবেই প্রকাশ পেল জামে উলুর অবয়ব।

---

[৩১] ইরানি কিংবদন্তি যালের পিতা, তিনি তাঁর যুদ্ধ ও বীরত্বের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন।

কসোভোর মাটিতে সার্ব বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের গতিপথ পালটে দিয়ে মূলত সফল সেনানায়ক হিসেবে সুলতান বায়জিদের আত্মপ্রকাশ। চক্রান্তের শিকার হয়ে তাঁর পিতা শহিদ হওয়ার পর রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকরা নিঃসংকোচে তাঁকে সুলতানদের সুলতান হিসেবে মনোনীত করেন। তিনিও নিজ ক্ষমতাবলে সিংহাসনের অধিকার এক প্রকার ছিনিয়ে নেন। কিন্তু নাবলুস যুদ্ধ বিজয়ের মাধ্যমে তিনি বিশ্বের সামনে নিজের সক্ষমতার প্রমাণ তুলে ধরেন। আনাতোলিয়া থেকে রুমলিতে বিদ্যুৎ গতিতে সৈন্যবহর স্থানান্তর করে তিনি "বজ্র" উপাধি লাভ করেন। সেখানে কল্পনাতীতভাবেই তিনি বজ্রগতিতে সেনা সমাবেশ ঘটান। আওলিয়া চিলবি তাঁর এই অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের ইতিহাস বর্ণনা করেন—

'বজ্র বায়জিদ সিনোপি থেকে এফলাক (উইলাচিয়া) পর্যন্ত জয় করে নেন মাত্র এক বছরের মধ্যে, এরই মাঝে তিনি তাঁর পিতার সাথে বুরসায় সাক্ষাৎ করতে আসেন সাতবার। তাঁর পিতা তাঁকে বলত, "হে বায়জিদ, তুমি তো বজ্রের মতো হয়ে গেছো"। এরপর থেকে তাঁর নাম হয়ে যায় বায়জিদ খান বজ্র (স্বায়েকা)।'

বজ্র বায়জিদ এতোটাই দুঃসাহসিক ছিলেন যে, নাবলুস দুর্গ অবরোধ করে রাখা ক্রুসেডার বাহিনীর সারি একাই ছিন্নভিন্ন করে দুর্গপ্রধান দোগান বে'র কাছে সংবাদ নিয়ে যান। ঐতিহাসিক নথির বর্ণনামতে, তিনি ছিলেন তামাটে লাল চামড়ার ব্যক্তি (কাবির ফালকিন এর মতে, তাঁর ত্বক ছিল লালাভ ও হলুদাভ শুভ্র বর্ণের)। গোলগাল মুখাবয়ব। সবুজাভ নীল চোখের ওপর ছিল দুজোড়া ঘন ভ্রূ। হলদেটে শ্মশ্রু ও বড় আকারের নাকের চেহারায় ছিল ভীতিসঞ্চারী ভাব। সুদীর্ঘ দৈহিক কাঠামো ছিল নিখুঁত পেশিবিশিষ্ট।

বায়েজিদের শিকারের অদম্য নেশা ছিল। তিনি বিপুল সংখ্যক শিকারী সদস্যের একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। প্রাচীন তুর্কি শাসকদের রীতি ধরে রেখেই তিনি এ প্রকল্পের উদ্যোগ নেন। প্রতিষ্ঠানটির জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে জমিও দান করেন।[৩২] এভাবেই আমরা দেখতে পাই, বায়জিদ বজ্রের প্রতিষ্ঠিত সেই শিকারকেন্দ্রটি চতুর্থ মুহাম্মদের সময়কালে উসমানি রাজপ্রাসাদে আধুনিকতার শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করে। ইউরোপের বিখ্যাত সব তিরন্দাজদের যারা বন্দি ও পরাজিত হয়ে বুরসার প্রাসাদে আসত তাদেরকে কাছে টেনে নিতেন এই শিকারকেন্দ্রের উন্নতির জন্য। এই বৃহত্তর শিকারকেন্দ্রকে তিনি উলু পাহাড়ের শিকারক্ষেত্রের সাথে মিলিয়ে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যান।

তাহলে কি ধরে নেওয়া যায় সুলতানদের চতুর্থ সুলতান শিকারের নেশাতেই বুঁদ হয়ে থাকতেন আর অন্য কোনো অনুশীলন বা প্রশিক্ষণের দিকে তাঁর খুব একটা আগ্রহ ছিল

---

[৩২] ওয়াসফি মাহের কুজা তুর্ক লিখিত '*উসমানীয় সুলতানগণ*' গ্রন্থ, ষষ্ঠ সংস্করণ, আংকারা ১৯৬৮, আদাবিয়্যাত প্রকাশনী, পৃষ্ঠা : ৩১।

না?! তা অবশ্যই না। ইতিহাসবিদরা বলছেন তিনি ছিলেন একজন দক্ষ কুস্তিগির বা মল্লযোদ্ধা। অস্ত্র চালনা ও অশ্বচালনার বিষয়ে তাঁর নৈপুণ্যের কথা লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিকদের যেন তর সয় না।

ইতিহাস আমাদের জন্য তাঁর সম্পর্কে আরও একটি চমকপ্রদ তথ্য নথিভুক্ত করেছে। যদিও তিনি গতানুগতিক কবি ছিলেন না, তবে তিনি কাব্য রচনায় পারদর্শী ছিলেন। বরং এই সুলতানদের সুলতান কাব্য পরিবেশনে ছিলেন পুরোদস্তুর কিংবদন্তি। বর্ণিত আছে বেশ কিছু জমকালো আসরে তিনি “বজ্র” ছদ্মনামে কাব্যপাঠ করেছেন। যদি ধরে নিই এই নামটি তাঁর ছদ্মনাম, এ ক্ষেত্রেও বলতে হয় তিনি ছদ্মনাম ব্যবহারকারী প্রথম সুলতান। তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সাহিত্যবিশারদদের মূল্যায়ন হলো—তিনি গোত্রীয় আঞ্চলিক পরিভাষা ব্যবহার করে সাবলীল ভাষায় কাব্য রচনা করতেন; বলা চলে তিনি ছিলেন জনমানুষের কবি। তাঁর সেই আঞ্চলিক কাব্যের রেশ আমরা তাঁর নাতি চতুর্থ মুরাদের মধ্যেও দেখতে পাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর সাহিত্যকর্মের কোনো নমুনা আমাদের কাছে পৌঁছেনি।

♣♣♣

বজ্র বায়জিদের আরেকটি ঐতিহাসিক কৃতিত্ব হলো তিনি ইস্তাম্বুল অবরোধকারী প্রথম উসমানীয় সুলতান। অবরোধ তাও শুধু একবার না, দ্বিতীয়বার অবরোধের সময় তো দুর্গ প্রায় জয় করেই ফেলছিলেন। বাইজান্টাইন সম্রাট ইস্তাম্বুলে একটি ইসলামি এলাকা প্রতিষ্ঠা, একটি জামে মসজিদ নির্মাণ ও এর ইমাম খতিব নির্ধারণসহ মুসলমানদের আইনশৃঙ্খলা দেখভালের জন্য একজন বিচারক নিযুক্তের বিনিময়ে বায়জিদ অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। সুতরাং ইস্তাম্বুলে বসবাসকারী প্রথম মুসলিমদের আনা হয়েছিল তোরাকালি প্রদেশের অন্তর্গত গোয়নুক ও ইয়ানজা এলাকা থেকে। সেখানে তাদেরকে বসতি করে দেওয়া হয়। কিন্তু ১৪০২ সালে আংকারায় তৈমুর লঙের কাছে উসমানীয়দের পরাজয়ের সুযোগ নিয়ে বাইজান্টাইন সম্রাট মুসলমানদেরকে ইস্তাম্বুল শহর থেকে বের করে দেয় এবং জামে মসজিদটি গুঁড়িয়ে দেয়।

বলা হয় বজ্র বায়জিদই প্রথম সুলতান যিনি “সারাসির” (স্বর্ণ, রূপা ও রেশম দিয়ে নকশা করা পশমি চামড়ার পোশাক) পরিধান করেছেন। তিনি স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে পানাহার করা প্রথম শাসক। জ্যোতির্বিদ প্রধান শায়খ আহমদের মতে, তিনি বুরসায় উৎপাদিত ফুলেল মখমলের কাফতান বা আলখেল্লা পরতেন। জনশ্রুতি আছে, শাসকদের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত স্বর্ণখচিত মখমলের কামিজ তিনিই প্রথম গায়ে দেন। উসমানীয় শাসক পরিবারে তিনিই প্রথম অ্যালকোহল পান করেন।[৩৩]

---

[৩৩] *নাদহাত সিনাত উয়গুন, ‘আল-কানুনির যুগের অন্তরালে’, হায়াত তারিখিয়্যা ম্যাগাজিন, প্রথম সংখ্যা,* জানুয়ারি ১৯৭৩। পৃষ্ঠা : ২০।

পূর্বপুরুষদের অনুকরণেই তাঁর জামার আলপনা করা হতো। বলা হয়ে থাকে, তিনি নিবলুসে আনীত ইংরেজ, ফরাসি ও জার্মান বন্দিদেরকে মুক্তি দেওয়ার সময় বুরসীয় (বুরসা নগরীতে উৎপাদিত) কাপড় উপহার দিতেন। ফরাসি ভাষায় লিখিত তক্তরেট অভিসন্দর্ভ ‘Rouillard’ এর তথ্য অনুযায়ী, চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকেই উসমানীয় কাপড় প্যারিসে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

বায়জিদের বিভিন্ন দ্বীনি তরিকতের সাথেও সম্পর্ক ছিল। তাঁর শ্বশুর আমির সুলতান বুরসা নগরীর একজন কুতুব ছিলেন। তিনি বীরমিয়াহ্ তরিকতের অনুসারী ছিলেন। বর্ণিত আছে বায়জিদ তাঁর শ্বশুরের অনুসৃত তরিকতের সাথে নিজেকে জড়াননি। বরং তিনি তাঁর সময়ে সবচেয়ে প্রভাবশালী তরিকত যায়নিয়্যাহ'র সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।[৩৪]

পরিশেষে একটি আশ্চর্যজনক তথ্য যোগ না করলেই নয়, প্রচলিত আছে বায়জিদ অজু করতেন রূপার এক বিশাল চৌবাচ্চা থেকে। তবে এই কথাকে সমর্থন করে এমন কোনো সূত্র বা দলিল দস্তাবেজ নেই। কিন্তু উলু জামে মসজিদের মাঝখানে যে চৌবাচ্চা ও পানির কল এখনও বিদ্যমান আছে তা কি তাঁর অজুর প্রতি ভালোবাসাকে প্রমাণ করে না?![৩৫]

গুজব আছে যে, তৈমুর লঙের হাতে বন্দি হওয়ার পর বায়জিদ তাঁর আংটিতে লুকানো বিষ পান করেই আত্মহত্যা করেছেন। তবে এই গুজবের কোনও ভিত্তি নেই, তাঁর মতো ব্যক্তি বন্দি হওয়ার মতো অসতর্ক থাকার প্রশ্নই আসে না। বিশেষ করে বন্দি অবস্থায় কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পর কেন আত্মহত্যা করবেন? আত্মহত্যা হোক আর যাই হোক রাজনৈতিক ও আত্মমর্যাদার দিক থেকে তাঁর মৃত্যু ছিল সৌভাগ্যের, যার ফলে তিনি তৈমুর লঙের লাঞ্ছনা ও নির্যাতন থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। তাঁকে জোরপূর্বক হত্যা করার বিষয়টিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মৃত্যুর পর সাময়িকভাবে তাঁকে সাইদ আহমাদ হায়রানির গোরস্থানে দাফন করা হয়। এরপর মুসা চিলাবি তৈমুর লঙের কাছে বার্তা পাঠান যে, তাঁর পিতার সুলতানি রাজকীয় জানাজা অনুষ্ঠান প্রয়োজন এবং তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী মরদেহ বুরসার দ্বীনি মাদরাসা (যাইকা কলেজ) প্রাঙ্গণে দাফন করা হবে। অতঃপর তাঁর মরদেহ বুরসায় আনা হয় এবং উল্লিখিত স্থানে দাফন করা হয়।[৩৬]

---

[৩৪] দেখুন- *আল-মুজাজুল মুতাওয়াসসিতুল ফিত-তারিখিত তুর্কি*, লেখক- হাসান একেন্স, ২০০০ সালে উফুক প্রকাশনী থেকে ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা : ৮২।

[৩৫] ইয়াহিয়া বুলতানজাদা, *“আত-তারিখুল তুর্কি”*, পৃষ্ঠা : ৪৮।

[৩৬] মুনদার আকুশাল রচিত *রুসুমুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ ওয়া মারাসিমুহা আল-মারাসিমুল ইস্তাম্বোলিয়া*। ইস্তাম্বুল ২০০৪, চিন্তক ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা : ১৫৯।

কুস্তিগির সুলতান
প্রথম মুহাম্মদ (চিলবি)

[শাসনকাল : ১৪১৩-১৪২১]

মুহাম্মদ চিলবির অবদান ও সাফল্য তাঁর নাতি সুলতান সেলিম আল-কাতি' (ইয়াভিজ) কিংবা তাঁর মিতা দ্বিতীয় মুহাম্মদ আল-ফাতিহর কীর্তির সামনে ইতিহাসে অনেকটা মলিন। কিন্তু প্রকৃত মূল্যায়নে বড় পরিসরে তাঁর কৃতিত্ব আলো ছড়ালে তা কোনো অংশেই কম গুরুত্ববহ নয়—আবদুর রহমান শরফ বেগ।

তৈমুর লঙের বিভীষিকাময় যুগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পর উসমানি রাষ্ট্র বুনিয়াদের দ্বিতীয় স্থপতি হিসেবে স্মরণ করা হয় মুহাম্মদ চিলবিকে। ইতিহাস তাঁকে পেটানো গড়নের বলে বর্ণনা করেছে। ধূসর শ্মশ্রু, গোলাকার মুখাবয়ব, প্রশস্ত বুক যেন নির্ভয়ের প্রতীক। অন্য বর্ণনায় তাঁর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে—তাঁর ছিল প্রশস্ত কপাল, উজ্জ্বল কালো চোখ, বাঁকানো ভ্রূ, ঘন দাড়ি, ব্যাপৃত কাঁধ ও ক্ষীণ কাঠামো।[৩৭] কিন্তু একজন ক্ষীণকায় ব্যক্তির পক্ষে খ্যাতিমান কুস্তিগির হওয়াটা অসম্ভব যেমনটা আমরা একটু পর জানতে পারব। হামের এর বর্ণনায় তিনি ছিলেন জনপ্রিয় উসমানি সুলতান।

---

[৩৭] নাজলাত সক্কা উগলু রচিত '*প্রথম মুহাম্মদ (চিলবি)*', *মুহাম্মদ আল-আওয়াল (চিলবি) মওসুআতু হাকামিল উসমানিয়্যিন ওয়া আ'মালিহিন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮২।

তার জনপ্রিয়তার পেছনে তাঁর দেহসৌষ্ঠব, সুরুচি ও প্রজ্ঞার ভূমিকা ছিল যা তাঁকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব দান করেছিল। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছিল চিলের মতো তীক্ষ্ণ, তিনি ছিলেন সিংহের মতো শক্তিশালী।

বলা হয় তিনি শৈশবে ধনুকের ছিলা তৈরি করতেন। এ কারণে তাঁকে ‘ওয়াস্তার’ বা ছিলা নির্মাতা ডাকা হতো।[৩৮] কিন্তু অন্য সূত্রে জানা যায় তাঁর উপাধি ছিল ‘কুস্তিগির’।[৩৯] কিছু কিছু গ্রন্থে তাঁর নাম নেওয়া হয়েছে “কুস্তিগির চিলবি” হিসেবে। এ নামকরণের কারণ হিসেবে বলা যায়, ফারসি ভাষায় সেই সময়ে কুস্তিগিরকে “কুশতিগির” ডাকা হতো।[৪০] ঐতিহাসিক হামের যথেষ্ট নিশ্চিত যে, কুস্তিগির হওয়ার জন্য যত গুণ লাগে সবই মুহাম্মদ চিলবির মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তিনি বলেন- কিরিশচি/ওয়াস্তার (ছিলা নির্মাতা) নামটি পাশ্চাত্য গ্রন্থগুলোতে অনুবাদ হতে গিয়ে ভুলের শিকার হয়েছে। সার্বিয়ান ঐতিহাসিকরা কিরিশচি/ওয়াস্তার নামকে লিখেছে Kiricheld, Tzirizla.[৪১]

অনেকের মতে, তিনি ছিলেন দড়িওয়ালা (দড়ি প্রস্তুতকারক)।[৪২] তাঁর পেশা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক একপাশে রেখে যে কথাটি সর্বজনীনভাবে গৃহীত তা হচ্ছে—অস্থিরতা ও ফিতনায় জর্জরিত উসমানি রাষ্ট্রকে তিনি পুনর্জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন হারানো গৌরব।

পিতার মতোই তাঁর শিকারের নেশা ছিল। এই নেশাই তাঁর জন্যে কাল হয়েছিল। আদির্নাতে এক শিকার অভিযান প্রাক্কালে বন্য শূকর তাড়াতে গিয়ে তিনি পড়ে যান। মেরুদণ্ডে আঘাত পেয়ে তিনি প্যারালাইজড হয়ে যান, পরবর্তীতে মারা যান। যুদ্ধনথিতে রেকর্ড আছে তিনি চব্বিশটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর শরিরে চল্লিশটি আঘাত ছিল। (উসমানি রাজপরিবারের প্রথম প্রজন্মের সুলতানদের শারীরিক আঘাত ছোটোখাটো কিছু ছিল না, কারণ তারা শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে রণক্ষেত্রের কেন্দ্রে প্রবেশ করত। উদাহরণত, রণক্ষেত্রে লড়তে গিয়ে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ চোখ হারান। তেমনি সুলতান আল-ফাতিহ বেলগ্রেডের যুদ্ধে হাঁটু কিংবা উরুতে প্রচণ্ড আঘাত পান)।

---

[৩৮] *আল-সালাতিনুল উসমানিয়্যুন*, লেখক- মুনির আতালার, *মাজাল্লাতু কুল্লিয়াতিল ইলাহিয়্যাত ফি জামিআতি আনকারা*, সংখ্যা- XXIV, ১৯৮১, পৃষ্ঠা : ৪৩১।

[৩৯] উসমানীয়দের কাছে ‘কুরশতাশি/তিরন্দাজ’ ও ‘গুরুশতাশি/কুস্তিগীর’ এই শব্দের মধ্যে সাদৃশ্য ছিল। (অনূদিত)

[৪০] মতিন আন্দ লিখিত *আর-রিয়াদাতু ওয়াল-লাহু ওয়াল-লা'বু ফিল কারনিস সালিস আশার* প্রবন্ধ, হায়াতে তারিখিয়্যা ম্যাগাজিন, দ্বিতীয় সংখ্যা, মার্চ, ১৯৭০। পৃষ্ঠা : ৬।

[৪১] *তারিখুল উসমানিয়্যিন আল-কাদিম*, হামের, প্রথম খণ্ড, ইস্তাম্বুল ১৯৮৯ সালে উতশরাস প্রকাশনী থেকে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা- ৪০৫ ও ৫৮৪ এর ১ম টীকা দ্রষ্টব্য।

[৪২] আয়হান তান ইরি রচিত *আল-হারবু ফি মারহালাতি তা'সিসিদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ,* আংকারা ১৯৭৮, আংকারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও ভাষা অনুষদ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা : ১০৪।

চিলবি ছিলেন উসমানীয় শাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী। তিনি আমাসিয়া ও মারযিফনের গভর্নর থাকাকালীন এ দুই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ারী নিয়ে দুইটি দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দুই দলকেই আলাদা আলাদা ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করতেন। বিভিন্ন ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় উভয় দল অংশগ্রহণ করত। রাজপ্রাসাদেও তাদের অনেক ভক্ত ছিল। সময়ের সাথে সাথে এই দুইটি দল দুইটি বিখ্যাত ক্রীড়া সংগঠনে রূপ নেয়। মারযিফনবাসী তাঁদের সংগঠনের প্রতীক হিসেবে বেছে নেয় 'মোড়ানো পাতা'। অন্যদিকে আমাসিয়াবাসীর প্রতীক ছিল 'ঢেড়শ'। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই দুই ঘোড়দৌড় সংগঠনের আন্ত-প্রতিযোগিতা অব্যাহত ছিল।[৪৩] এমনকি মুহাম্মদ চিলবির উদ্যোগে নির্মিত রাস্তা যা এখন ইস্তাম্বুলের চেঙ্গেলকেয়ী উপজেলায় অবস্থিত, ওই রাস্তার মাথায় এখনও সেই দুই ক্রীড়া সংগঠনের চিরবৈরিতার স্মৃতিফলক সাঁটানো আছে, কোনো এক প্রতিযোগিতায় বিজয়ের পর মর্মর পাথরে তৈরি ফলকটি সেই পথের ধারে লাগানো হয়েছিল।

ইতিহাসবিদিত যে, সুলতান মুহাম্মদ চিলবির ব্যক্তিগত পাঠাগার ছিল। বিখ্যাত আরব পদব্রজক ইবনে আরবশাহ তাঁর শাসনামলে আদির্না পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সুলতানের উপকার ও চমৎকার ব্যবহারে তিনি সিক্ত হয়েছিলেন। আদির্নাতে দীর্ঘদিন অবস্থানকালে ইবনে আরবশাহ প্রচুর অনুবাদের কাজে স্বাক্ষর রেখেছেন। এমনকি তিনি রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকেও উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সুলতান তাঁকে ব্যক্তিগত লেখক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। সুলতানের মৃত্যুর পর ইবনে আরবশাহ পুনরায় কায়রোতে ফিরে আসেন।[৪৪] প্রাসাদে থাকাকালীন তাঁর অনূদিত *"তাফসিরে আবিল লাইস সমরকন্দি"* পরবর্তীতে তিনি মুহাম্মদ চিলবির নামে উৎসর্গ করেন।[৪৫]

ঐতিহাসিক খায়রুল্লাহ এফেন্দির মতে, মুহাম্মদ চিলবি ছিলেন স্বভাবজাত লেখিয়ে ও কবি। তিনি তাৎক্ষণিক কবিতা রচনা করতে পারতেন। আলেমসমাজ ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর যত্ন ও শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম।[৪৬]

হারমিয়্যিন অনুযায়ী, হজ ও হাজিদের জন্য সুলতানি উপঢৌকনের চল শুরু হয় তাঁর আমলে। প্রথম যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত আর্থিক দৈন্যতা সত্ত্বেও তা অব্যাহত ছিল।[৪৭] তবে

---

[৪৩] মতিন আন্দ সংকলিত স্কাই লাইফে প্রকাশিত *আলওয়াউম মিডাদাতিত তুর্কিয়াতিল কাদিমা* ২০০৪/১, পৃষ্ঠা ১২২-১২৪।

[৪৪] তুন ইরি রচিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮।

[৪৫] হিলায়াত আয়দার, *তরজমাতুল কুরআন ওয়া তাফাসিরুহু ফিল আহদিল উসমানি, আল হায়াতুল কুরআনিয়া ম্যাগাজিন* সংখ্যা- ১৩, জুলাই-আগস্ট ২০১০, পৃষ্ঠা : ৪৭।

[৪৬] *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, খয়রুল্লাহ এফেন্দি, তৃতীয় খণ্ড, যহী দনশমান প্রস্তুতকৃত। ১৯৭১ ইস্তাম্বুল 'শেফের বাঁটা' প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-১৯৩।

সেই উপহারের থলেতে কী কী উপঢৌকন থাকত তা অজানা রয়ে গেছে। দ্বিতীয় বায়েজিদের শাসনামল সম্পর্কে জানা অবধি তা অনুল্লেখ থাকুক।

মুহাম্মদ চিলবির পোশাক সম্পর্কে বিভিন্ন নথিপত্রের বার্তা হচ্ছে, তিনি লাল পাতলা রেশমি জামা পরতেন, এর ওপরে চাপাতেন "দীবা", (দীবা হলো স্বর্ণ ও রুপা খচিত রেশমি কিংবা মখমলের মোটা কামিজ)। হামেরের তথ্য অনুযায়ী, অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের থেকে ভিন্নভাবে পাগড়ি পরিধান করতেন। তিনি টুপির ওপর পাতলা রুমাল দিয়ে কয়েক স্তরের ভাঁজ বাঁধতেন। এর ওপর কয়েক ধরনের গোলাপ গুঁজে দিতেন। ফলে টুপির চূড়া ছাড়া আর সবটুকু পাগড়ির আড়ালে ঢাকা পড়ে যেত। তাঁর আলখেল্লা পূর্বপুরুষদের ঢঙেই বানানো হতো। তবে শেষ জীবনে তাঁর জামার ভেতরাংশে বেজির লোম ব্যবহার করতেন। জামার আস্তিনেও বেজির পশম ব্যবহার করা হতো।[৪৮]

যদিও উসমানীয় সুলতানদের কেউই পবিত্র হজ পালন করতে পারেননি, তবে এক বর্ণনায় জানা যায় তিনি আমির থাকাকালীন হজব্রত পালনের সংকল্প করেছিলেন। ইয়াহয়া এফেন্দি বুস্তানজাদার ইতিহাস গ্রন্থে এমনটি উঠে এসেছে।[৪৯] মুহাম্মদ চিলবির পাশাপাশি দ্বিতীয় বায়জিদ, চিরনবীন উসমান ও আমির কুরকুতও হজের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন বাধা বিপত্তির কারণে তারা হজ পালন করতে পারেননি। উসমানি শাসক পরিবারের মধ্য থেকে একমাত্র সুলতান ওয়াহিদই মক্কা গমন করে হজ আদায় করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

ইয়াহয়া বুসতানজাদা তাঁর লেখায় প্রথম মুহাম্মদের একটি বিশেষ মহৎ ও নম্র গুণের কথা উল্লেখ না করে পারেননি—

"জনসেবার আতিশয্যে তিনি নিজ অর্থায়নে প্রতি জুমাবার গণখাবারের আয়োজন করতেন, নিজ হাতেই তা ফকির মিসকিনদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। তাঁর অশেষ বদান্যতার আরও দৃষ্টান্ত হচ্ছে তিনি এতিমদের যেভাবেই হোক খুশি করতেন, বিপদগ্রস্তদের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতেন।"

* * *

---

[৪৭] মুলা দুমান প্রস্তুতকৃত ও আবদুর রহমান শরফ লিখিত *তাকভিমুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ* কুব্বাতুস সামা প্রকাশনী থেকে ২০০৫ ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা : ৯৯।

[৪৮] হামের রচিত প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪০৩। অতীতে এটি বাহ্যিক জামা হিসেবে পরা হতো না, বরং ভেতরে পরা হতো, তবে এর কিছু অংশ বাহির থেকে দেখা যেত। এর নাম ছিল "কলবুল ফিরা/পশমের অন্তর"।

[৪৯] ইয়াহিয়া বুসতানজাদা রচিত "*আত-তাকভিমুন নাকি*", পৃষ্ঠা : ৫৩।

প্রজ্ঞাবান সুলতান : দ্বিতীয় মুরাদ

[শাসনকাল : ১৪২১-১৪৫১]

দ্বিতীয় মুরাদের সময়ে আরবি ও ফারসি ভাষার প্রচুর বইপুস্তক তুর্কি ভাষায় অনূদিত হয়, তুর্কি সাহিত্য শীর্ষচূড়ায় আরোহণে তাঁর শাসনকালটি ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে—খলিল ইনালজিক।

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের দৈহিক বর্ণনায় এসেছে—তিনি ছিলেন পেশীবহুল দেহের অধিকারী। গোলাকার চেহারা, প্রশস্ত সিনা, নীলাভ চোখ ও মেহেদিরাঙা দাড়ির ফ্রেমে সুশ্রী মুখাবয়ব ছিল তাঁর। তাঁকে বিখ্যাত পর্যটক Bertrandon de la Broquiere আদির্নাতে ১৪৩২ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ মুহাম্মদ আল-ফাতিহর জন্মের বছরে দেখেছেন, এবং তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

'তিনি ছিলেন হৃষ্টপুষ্ট মানুষ, খর্বকায়, গোলগাল চেহারা। দেখতে তাতারিদের মতো। বাদামি চামড়া। চোখজোড়া কিছুটা ছোটো, চোয়ালের হাড়জোড়া চোখে পড়ার মতো ভাসানো। সভাসদদের সাথে দরাজ গলায় কথা বলতে শুনেছি।'

দ্বিতীয় মুরাদের শাসনকাল থেকেই আমরা সুলতানি ঘরানার বিনোদনের নজির দেখতে পাই। এ সময় বাদ্যবাজনা ও কাব্যের আসর জমতে শুরু করে। শিল্পীগোষ্ঠীর জন্য—বিশেষ করে বাজনাবাদক ও কবিদের জন্য আলাদা সুযোগ-সুবিধা চালু হয়, যা

এই সংস্কৃতিকে কয়েক যুগ পর্যন্ত অব্যাহত রাখে। বাদ্য ও কাব্য সংস্কৃতির প্রতি দ্বিতীয় মুরাদের অনুরাগ তাঁর হাতে শুরু হওয়া এই বিনোদনকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। ডক বার্গোনিয়ার উপদেষ্টা Bertrandon de la Broquiere এর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় ১৪৩৩ সালে আদির্নার প্রাসাদে বাদক কবিদলের আবির্ভাব ঘটে। সেইবার তিনি বাদক কবিদলের পরিবেশিত 'সাহসিকতার গান' উপভোগ করেন।[৫০]

পুরো শাসনকালজুড়ে—দুইবার পুত্রের জন্য সিংহাসন ছেড়ে দেওয়া ছাড়া বাকি ত্রিশ বছরের শাসনকালে পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে বাদকদলেরা প্রাসাদে ভীড় করতে শুরু করে। উদাহরণ স্বরূপ, প্রাচ্যের বিখ্যাত পারসিয়ান সুরসম্রাট আবদুল কাদের মিরাগি তাঁর সুরবিদ্যার ওপর লিখিত *"মাকাসিদুল আলহান"* গ্রন্থটি দ্বিতীয় মুরাদের জন্য উপহার পাঠান। গ্রন্থটি এখনও তোপকাপি জাদুঘরের "ইরওয়ান" প্রাঙ্গণে সংরক্ষিত আছে।

♣♣♣

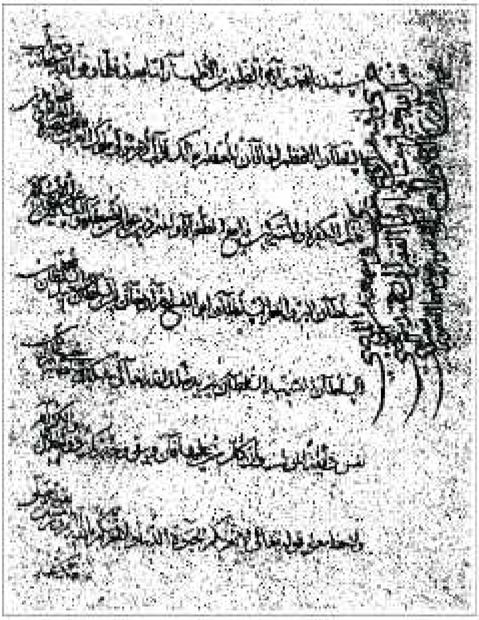

দ্বিতীয় মুরাদের অসিয়ত—তাঁর কবরের ওপর যেন গম্বুজ নির্মিত না হয়।

---

[৫০] বুলন্দ আকসাওয়ি রচিত *হাওলা আলাকাতিল মুসিকা আত-তারকিয়িয়া নিই তিবাদিহা সাকাফাতান উখরা,* আর্কাইভ। সংখ্যা ৭১-৭২, মার্চ-এপ্রিল ১৯৯৫, পৃষ্ঠা : ২১১ ।

অসুস্থতার দরুন ছেলে উরহানের জন্য গাজি উসমানের সিংহাসন ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা বাদ দিলে আমরা দেখতে পাই দ্বিতীয় মুরাদই একমাত্র সুলতান যিনি স্বেচ্ছায় অন্য কারও জন্যে সিংহাসন ছেড়ে দেওয়ার দলিলে স্বাক্ষর করেন। তিনি তাঁর পুত্র মুহাম্মদের জন্যে দুই-দুইবার ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করেন। এ কারণে তিনি উসমানীয় শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে বিরল সম্মানের অধিকারী হয়ে আছেন। (সামনে আমরা দেখব প্রথম মুস্তফাও একই নজির স্থাপন করেছিলেন, তবে বলা বাহুল্য তাঁর সিংহাসন ত্যাগও ছিল অসুস্থতার কারণে)।

কাবির ফালকিয়িন বলেন—‘তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ ছিল তাঁর সম্মানিত পূর্বসূরির মতোই।’ পিতৃপুরুষের প্রচলিত পোশাকরীতি পরিবর্তন করা তিনি জরুরি মনে করতেন না। ফরাসি পর্যটক Bertrandon de la Broquiere যিনি দ্বিতীয় মুরাদের সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ পান তাঁর সুস্বাস্থ্যের সময়েই, তার বিবরণ হলো—তিনি পশমি ও মখমলের পাতলা লাল জামা গায়ে দিতেন। পশমি টুপির ওপর পাগড়ি পরতেন আর পশমি সিংহাসনে বসতেন। মুহাম্মদ আল-ফাতিহর শাসনামলের আগপর্যন্ত সকল উসমানি সুলতান পশমি টুপি ব্যবহার করতেন।

বুরসায় থাকাকালীন দ্বিতীয় মুরাদের আসরগুলো গন্ধকপূর্ণ জলাধার বিশিষ্ট হতো। আসরে জমে উঠত গান, বাজনা আর নৃত্য। ডালিমের শরবত আর উন্নত জাতের ছাগলের ভুনা দিয়ে আপ্যায়ন চলত ভোর পর্যন্ত।

উসমানি সুলতানদের মধ্যে দ্বিতীয় মুরাদ কাব্য রচনাকে প্রথম পেশাদার রূপ দান করেন। তাঁর নিজের কাব্যে তিনি “শিল্পী মুরাদি” ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। *লতিফি*’র *রোজনামচার* তথ্য অনুযায়ী, তিনি নিজে আবৃত্তি করতেন খুব কম। তবে সপ্তাহে দুইবার অনুষ্ঠিত হওয়া কবিতার আসরে তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে আবৃত্তি শুনতেন ও মূল্যায়ন করতেন। আসরে কবিগোষ্ঠী ও উলামা হজরতগণ উপস্থিত থাকতেন। এ ছাড়া আলোচক নির্ধারণ করে প্রতি সপ্তাহে একবার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা হতো।[৫১]

তাঁর সময়েই কবিদের জন্য নির্দিষ্ট বেতনভাতা চালু হয়। এই উৎসাহমূলক মাইনে সুলায়মান আল-কানুনির শাসনকাল অবধি প্রায় এক যুগ চলমান ছিল। পরবর্তীতে প্রধান উজির রুস্তম পাশা এর অপকারিতা লক্ষ করে এই প্রথা রহিত করেন (১৫৪৪)।

উসমানি কাব্য জগতের এক প্রথিতযশা কবি শাহী বেগ সুলতান মুরাদের সেই অবদানের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছিলেন—

---

[৫১] মুস্তফা ইসান প্রস্তুতকৃত *তুযকারাতু লতিফি*, ১৯৯৯ আংকারা, আকচাগ/শুভ্র যুগ প্রকাশনী। পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯।

‘উসমানি বংশধারায় সুলতান মুরাদকে ডাকা হয় আবুল খায়র (কল্যাণের বাহক)। যে সুলতান কল্যাণের ফোয়ারা ছুটিয়েছিলেন তাঁর জন্যে এমন নামকরণ আশ্চর্যের কিছু না, তিনি এমন এক সুলতান ছিলেন, অলংকারপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক ছন্দ ও কাব্য চয়ন যার নখদর্পণে ছিল।’

তিনি অনেক সময় নিজের মনের অনুভূতি অকপটে কাব্য দিয়ে প্রকাশ করতেন। এখানে তাঁর রচিত একটি প্রেমকাব্য তুলে ধরা হলো :

কাল রাতে প্রিয়াকে দেখলাম আত্মার রূপে সে অসুস্থ, তার উদরে দেখেছি আত্মার আঁচড়, তার অসুস্থ ঠোঁটে আমি আমার ঠোঁট দিলাম সঁপে, এটাই আত্মার চিকিৎসা হে হৃদয়ের ডাক্তার, হে বন্ধু, আদির্না হলো রূপসীদের অভয়ারণ্য, বুরসাতে লাস্যময়ীদের আনাগোনা আছে। গতরাতে আমি কবলুজায় গলে গেছি, জানো! যখন দেখলাম এক লাবণ্যময়ী খিলখিলিয়ে হাসছে। হে মুরাদি, আমার সালতানাত দিগদিগন্তে কিন্তু আমি বন্দি হয়ে গেছি ললনার চুলের বেণীতে।

শেষ পঙক্তিতে ‘সালতানাত দিগদিগন্তে’ শব্দ চয়নটির দিকে লক্ষ করুন। এই পরিভাষাটি আমি এতটাই ভালোবেসে ফেলেছি যে, আমার লিখিত এক বইয়ে মুহাম্মদ আল-ফাতিহর বৈশ্বিক আধিপত্য বুঝাতে আমি এই কথাটি ব্যবহার করেছি।

বেশ কিছু গ্রন্থ দ্বিতীয় মুরাদকে ‘প্রজ্ঞাবান সুলতান’ বলে অভিহিত করেছে ছেলের জন্য সিংহাসন ছেড়ে দেওয়ার মতো পরিপক্ব ও সুবিবেচিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে।

তাঁর শাসনকাল উসমানি সাহিত্য সংস্কৃতির এক অনন্য উচ্চতার সাক্ষী হয়ে আছে। বিশেষত রাজনৈতিক দর্শনজগতে অভূতপূর্ব সাফল্য রয়েছে। এসব অকস্মাৎ ঘটে যায়নি, বরং এর পেছনে কাজ করেছে সচেতন তৎপরতা। পূর্বে উল্লিখিত ইবনে আরবশাহ থেকে তিনি দীক্ষা লাভ করেছিলেন। যিনি ছিলেন তৎকালীন ক্ষণজন্মা উলামাদের একজন। এমন একজন ব্যক্তির কাছে সান্নিধ্যসহ জ্ঞান অর্জন করাটা সহজ বিষয় নয়।

একই সময়ে, তাঁর শাসনকাল ইতিহাসের আরেকটি সভ্যতার গ্রন্থীয় বিপ্লব দেখতে পেয়েছে। অনেকগুলো সূত্র বলছে, তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরি ছিল। মহামূল্যবান গ্রন্থসমূহের অনুলিপি তৈরিতে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, এত কিছুর পেছনে তাঁর সতর্ক ও চৌকশ মেধার ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেখা গেছে, জাতিগত ও প্রাচীন ধর্মীয় আন্তঃসম্পর্ক স্থাপনে তাঁর তাগিদ ছিল অপরিসীম এবং এ

বিষয়ে লেখালেখি ও গ্রন্থ রচনার পেছনে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক লাভ ছিল—তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।[৫২]

তিনি প্রাচ্যের রাজনৈতিক সাহিত্য গ্রন্থাদির প্রতি গুরুত্বের সাথে মনোযোগ দেন। এই বিষয়টিই ক্ষমতাসীন পরিবারটিকে সাম্রাজ্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা জোগায়। তাঁর সময়ের সেরা সাহিত্যিক আহমাদ মিরজিমিককে “কাবুস নামা” অনুবাদ করার দায়িত্ব দেওয়াটা প্রমাণ করে সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গুরুত্ব কতটা গভীর ছিল। এমনকি গ্রন্থ প্রস্তুত হওয়ার পর পাঠোদ্ধার করতে বেগ পেলে দ্বিতীয়বার অনুবাদ করার নির্দেশ দিতেন। এবং আহমাদ মিরজিমিকের কাছে বোধগম্য সাবলীল তুর্কি ভাষায় তা অনুবাদ করার অনুরোধ জানান। এ ছাড়া, বিখ্যাত বই “বদর দিলশাদ” যা পরে “মুরাদনামা” নামে পরিচিতি পেয়েছে তা দুর্বলতা ও জঞ্জালমুক্ত সাহিত্যভান্ডার হওয়ার পাশাপাশি উসমানি সমাজব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নানাবিধ উপদেশে পরিপূর্ণ।[৫৩]

এবার আসা যাক তাঁর বিভিন্ন দ্বীনি তরিকতের সাথে সম্পৃক্ততার ব্যাপারে। তাঁর সময়ে উসমানীয়দের মধ্যে যায়নিয়্যাহ্ তরিকতের পাশাপাশি মৌলভি তরিকতও প্রভাবশালী ছিল। হাজি বৈরম আলির সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। বৈরমী দরবেশদের ওপর থেকে কর মওকুফ করার ফলে এ সকল তরিকতগুলো আনাতোলিয়ায় রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ১৪৩৫ থেকে ১৪৫৮ সাল পর্যন্ত উসমানীয়দের কাছে বন্দি থাকা Fr. Georgius de Hungaria তাঁকে কাছ থেকে দেখে জানিয়েছেন, দ্বিতীয় মুরাদের সাথে দরবেশদের গভীর ঘনিষ্ঠতা ছিল।[৫৪]

মৃত্যুর পাঁচ বছর পূর্বেই দ্বিতীয় মুরাদ তাঁর অসিয়ত জানিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর সময়ের উলামা হজরতদের কাছে তা সত্যায়ন করে রেখেছিলেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাঁর দাফন-কাফনের খরচ নিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন। তাঁর লাল ইয়াকুত পাথর-বিশিষ্ট আংটি ও হিরার আংটি বিক্রি করে দাফন-কাফনের ব্যবস্থা যেন করা হয়। বিক্রি হতে দেরি হলে যেন বন্ধক রেখে হলেও দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা হয় সেই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আরও অসিয়ত করে যান তাঁর কবর যেন ছাদবিহীন ও গম্বুজ

---

[৫২] দেখুন প্রাগুক্ত *আত-তুর্কিয়ুন আদিল*, পৃষ্ঠা : ৯৯। প্রাচীন কিংবদন্তি সংগ্রহের কাজটি তাঁর নাতি সুলতান জেম চালিয়ে যান। সেই সময়ের সাহিত্যিক আবুল খায়র রুমী ‘সলতুক আগকর’ এর বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করেন যা ‘সলতুক নামা’ হিসেবে পরিচিত।

[৫৩] দেখুন আদম জিহান রচিত ‘*মুরাদনামা বদর দিলশাদ*’ গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, ১৯৯৭ ইস্তাম্বুলে জাতীয় শিষ্টাচার মন্ত্রণালয় প্রকাশনী থেকে মুদ্রিত।

[৫৪] খলিল ইনালজিক রচিত ‘*দ্বিতীয় মুরাদ*’। তুর্কি দ্বীনি ওয়াকফ থেকে প্রকাশিত ইসলামি বিশ্বকোষ। খণ্ড : ৩১, ইস্তাম্বুল ২০০৬, পৃষ্ঠা : ১৭১।

বিহীন খোলামেলা করা হয়: ‘বড় বড় সুলতানদের কবরের ওপরে যেভাবে স্থাপনা তৈরি করা হয় এমনটা আমার কবরে করো না, কবরের চারপাশের দেয়াল ছাড়া আর কিছুই যেন নির্মাণ করা না হয়। ছাদ দিয়ো না যেন আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি আমার ওপরে বর্ষিত হয়।’ অসিয়ত অনুসারেই বুরসায় অবস্থিত মুরাদিয়্যা কলেজ প্রাঙ্গণে তাঁর কবর উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

* * *

মানচিত্রপ্রেমী সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ

[শাসনকাল : ১৪৪৩-১৪৪৪ এবং ১৪৪৫১-১৪৮]

‘তাঁর সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল তাঁর চরিত্র, তাঁর ললাট ছিল চকচকে চওড়া, দুচোখে ছিল বজ্রদৃষ্টি। অপ্রশস্ত ঠোঁটের ওপর বাঁকানো নাকটি ছিল যেন বাজপাখির ঠোঁট। সর্বদা কর্মতৎপর ও চটপটে স্বভাবের ছিলেন। শারীরিক কাঠামো ছিল সমুন্নত ও লালচে। এইসব শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলো যেন খোদাই করে দেওয়া হয়েছিল তাঁর চারিত্রিক উৎকর্ষতার প্রকাশ্য চিহ্ন হিসেবে; যেমন তাঁর তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চাহনি, গম্ভীর ধৈর্য ও স্বভাবজাত উন্নত চরিত্র এবং সর্বোপরি তাঁর প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা ও অনুপম রণকৌশল।’[৫৫] —নামেক কামাল

ইতিহাসবিধৌত ফলাফলে চোখ বুলালে আমরা দেখি, মানুষের হৃদয়ে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহর জন্য আলাদা স্থান রয়েছে। আবদুল হামিদ, সুলায়মান আল-কানুনি কিংবা সালিম জব্বারের মতো কিংবদন্তি সুলতানদের জন্যেও মানুষের অন্তরে অফুরন্ত ভালোবাসা রয়েছে তা সত্য, কিন্তু মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হওয়ার দিক থেকে

---

[৫৫] নামেক কামাল, আল-আওয়াকুল মুতাজাদ্দাহ, রচনা : রজেব কারাদাগ ও উমর ফারুক হারমান। ইস্তাম্বুল। তারিখ অনুল্লেখিত ‘তরজুমান’ পত্রিকা, সংখ্যা- ১০০১, আর্কাইভ পৃষ্ঠা নং- ১১১, ১১২।

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ অন্যদের তুলনায় অনেক ওপরে। এর প্রধান কারণ হলো তাঁর ইস্তাম্বুল বিজয়; যার মাধ্যমে তিনি প্রিয় রাসুলের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়ন করেছেন। কিন্তু আরেকটি কারণ হলো তাঁর 'আবুল ফাতহ' উপাধি অর্জন। যার অর্থ বিজয়ের বাহক। তিনি উসমানি সীমান্তের পরিধি দ্বিগুণ করেছিলেন বলকান, আনাতোলিয়াসহ কৃষ্ণ ও ভূমধ্যসাগরের অববাহিকাগুলো বিজয় করার মাধ্যমে। দ্রুততার সাথে বিজিত অঞ্চলগুলোকে সুসংগঠিত করে তিনিই প্রথম উসমানি সাম্রাজ্যের প্রকৃত উন্মেষ ঘটান।

প্রাপ্ত তথ্যসূত্র অনুযায়ী, সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ ছিলেন সুঠাম দেহের অধিকারী। চওড়া কাঁধ ও ঘাড় তাঁর দেহকাঠামোকে আরও সুসংহত করেছে। তাঁর কোমর থেকে উর্ধাঙ্গ ছিল দীর্ঘকায়, কিন্তু কোমরের নিচের অংশ ছিল এর বিপরীত। তাঁর দেহসৌষ্ঠব ছিল তাঁর পিতৃপুরুষ উসমান গাজির অনুরূপ। তাঁর চেহারা ছিল লালচে ফর্সা। ভ্রূজোড়া ছিল ধনুকের ন্যায় বাঁকা ও টানটান। তিনি ছিলেন কোঁকড়া চুল ও ঘন কালো শ্মশ্রুমণ্ডিত ব্যক্তি। পুরুষ্টু ঘাড় আর বাজপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা ও তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ সর্বস্ব নাকের গড়ন তাঁর চেহারায় এনে দিয়েছিল অন্যরকম সৌন্দর্য।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, মুহাম্মদ আল-ফাতিহর এই দৈহিক বর্ণনা তাঁর পড়ন্ত বয়সের চিত্রায়ণ, কেননা একুশ বছরের টগবগে যৌবনে তিনি যখন ইস্তাম্বুল জয় করছিলেন তখনকার চিত্রায়ণ এই অবধি কেউ তুলে ধরতে পারেনি। তবে এটুকু নিশ্চিত করে বলা যায়, যখন তিনি ইস্তাম্বুলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করছেন তখন হয়তো তার মুখে দাড়িই গজায়নি কিংবা সবেমাত্র গজাতে শুরু করেছে। মোদ্দাকথা হলো, ইস্তাম্বুল বিজেতা তরুণ তুর্কি মুহাম্মদ আল-ফাতিহর চিত্রকর্ম কোনো চিত্রকর এঁকে যেতে পারেননি। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী জেনটিলা বেলিনি (Gentile Bellini (c. ১৪২৯ – ২৩ February ১৫০৭) আল-ফাতিহর যে চিত্র এঁকেছেন তা তাঁর শেষ জীবনের বৃদ্ধ অবয়বকে তুলে ধরেছে (সম্ভবত চিত্রটি আঁকা হয়েছিল ১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে), সেখানে দেখানো হয়েছে বার্ধক্যে তিনি অসুস্থতার দরুন ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। অথচ এর কিছুকাল আগেই দুজন বিখ্যাত আঁকিয়ে উসমান ও শিলবিলী উগলুর চিত্রকর্মে দেখা যায় তিনি এতটা দুর্বল হননি।

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের কাছে ইলম অর্জন করেছেন। তামজিদ উগলু, মুহাম্মদ চিলবি জাদা, মোল্লা ইলিয়াস, মুহাম্মদ কসাব জাদা ও মোল্লা গওরানীর মতো ব্যক্তিরা ছিলেন তাঁর শিক্ষক। তিনি আলেমদের সব সময় সম্মান করতেন এবং জ্ঞানের সুমহান মর্যাদার উপলব্ধি তাঁর মধ্যে ছিল। উলামাদের প্রতি তাঁর অমায়িক সমীহের ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই, এই ইতিহাস বরেণ্য সুলতান বিভিন্ন সময়ে আলেমদের সাথে আপস করতে নিজের রাজকীয় পরিচয় তুচ্ছ করেছেন। তাঁদের সাক্ষাতে রাজবংশের গৌরব-লোমশ টুপির ওপর সাদামাটা চাদর জড়িয়ে